কৃষি পরাশর

“সুবর্ণ রৌপ্য-মাণিক্য দুর্মূল্য বসন
আদিতে যিনি সজ্জিত,
তাঁকেও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কৃষকের
কাছে প্রার্থী হতে হয়”

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

কৃষি পরাশর
Krishi Porashor

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন* ।। *জনভাণ্ডার* ।। *অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম*।। *বই প্রকাশ পরিকল্পনা*।। *গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য, বহ্নিহোত্রী হাজরা

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, কোন্নগর, হুগলী

দাম ১০০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট, রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল, ১৮৬০

'এ'কদিন এক রাজনৈতিক সভায় দেশের এক বিরাট নেতা উচ্চৈঃশ্বরে বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতের কৃষক-বৃন্দকে জাগাইতে হইবে, যেহেতু তাহারা না জাগিলে দেশ জাগিবেনা। আমি তাঁহাকে বললাম, 'মহাশয়, আপনি টাউন হলে বক্তৃতা করিতে ও সংবাদপত্র লিখিতে থাকিবেন; আপনার পুত্র শামলা মাথায় দিয়া আদালতে হাকিমের এজলাসে বক্তৃতা করিতে থাকিবে; আপনার ভাগ্নে ও শালা মার্চেন্ট অফিসে সারাদিন কলম পিষিতে থাকিবে। আপনারা কেহই প্রাণ থাকিতে চাষাদের সঙ্গে মিশিয়া চাষবাস করিবেন না। সুতরাং, আপনারা চাষাদের জাগাইবেন কি করিয়া?'

- বকেশ্বরের বেয়াকুবি, হরিদাস হালদার, ভাদ্র ১৩২৮ সন

কৃষি পরাশরের পুনঃপ্রকাশ বাঙলাভাষায় 'দিশি কৃষি' চর্চায় একটি জরুরী সংযোজন। যে পুঁথির আরম্ভের আপ্তবাক্য- 'কৃষিকাজ আশীর্বাদ, কৃষিকাজ পবিত্র; কৃষিই সমগ্র জীবগণের জীবন' তা আমাদের 'ক্যাপিটালোসিন' (পুঁজিকেন্দ্রিক) সময়েরই পুঁথি। এই পুঁথি, 'জ্ঞান' বিষয়ক সকল পূর্বনির্ধারিত শর্তকেও ছিন্ন করে, জানান দেয় 'বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান যত্ন করে অর্জন করা প্রয়োজন' অথবা 'মেঘ ও জলের পরিমাণ 'আধক' সম্পর্কিত বিদ্যার্জনের প্রয়োজন। এ পুঁথিতে শাসক অনুপস্থিত, আছেন পালক, এবং তাকে অতি অবশ্যই হতে হবে কৃষক, কারণ 'জনগণের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী একজন সুদক্ষ ব্যক্তিরই কৃষিকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত কারণ অদক্ষ কৃষিজীবী দুর্দশা ডেকে আনে'। ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র তার 'মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ'এ জানিয়েছেন, 'মুঘল রাষ্ট্র সবসময় জমি চাষের জন্য কৃষকের অধিকারকে স্বীকার করত।' ... রাইয়তি কশথ' জমিকে মদৎ-ই-মায়েশরা কখনই নিজেদের 'খুদ কশথ' জমিতে রূপান্তরিত

করতে পারবেনা।....মুহম্মদ হাসেমের প্রতি আওরঙ্গজেবের ফরমানে বলা হয়েছে ‘যদি কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনতে কৃষক অক্ষম হয়, অথবা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে আরেকজনকে জমিটা দাও।...এবং যখনই ভূতপূর্ব মালিকরা জমি চাষ করতে সমর্থ হবে। তখনই তাদের জমি ফিরিয়ে দাও।’ তিনি আরো বলেছেন- ‘মধ্যযুগে প্রচলিত ইসলামিক অর্থনীতিতে মূল বক্তব্যই ছিল- কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা তার নূন্যতম জীবনযাত্রা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা অবশ্যই সীমিত থাকবে। রাষ্ট্র এমন কিছু দাবী করবেনা যাতে করে কৃষকের নূন্যতম জীবনযাত্রার মান বিপর্যস্ত হয়।’ যদিও, শ্রী-ভদ্র মুঘল কৃষিব্যবস্থার এই ‘পালক’রূপ ধারণের কারণ হিসেবে বলতে চেয়েছেন, মুঘল রাষ্ট্র জানত এহেন নীতি গ্রহণ না করলে ‘কৃষকের উৎপাদিকা ক্ষমতা কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা যায়।’ তার মতে, মুঘল আর্থব্যবস্থার মাথারা জানতেন ‘কৃষকের শ্রম জমি থেকে সম্পদ আহরণের জন্য অপরিহার্য।’ আজকের হিন্দুত্ববাদী-কর্পোরেটপোষ্য ভারতরাষ্ট্রের কাছে এহেন ‘কল্যাণমূলক’ বিবেচনা কেউ স্বপ্নেও আশা করেননা। কৃষি পরাশর, শিল্পবিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে কৃষিকাজকে সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবে ধিক্কৃত দুয়োরানি বানিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র-বিরোধী প্রস্তাবনাও বটে। এখানে কৃষককে জগতের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছে, তার জ্ঞানকে উদযাপনের কথা বলা হয়েছে, কৃষিকাজ যে মঙ্গলসূচক একটি আচার তার আবাহন করা হয়েছে - ‘যে কৃষক গবাদির যত্ন করে, দৈনন্দিন চাষের কাজে যায়, সঠিক ঋতু চেনে, বীজের বিষয়ে যত্নশীল ও অনলস পরিশ্রমী তিনি ধনাঢ্য হন এবং দুঃখভোগ করেন না।’ এই পরম্পরার রেশ পাওয়া যায়, প্রথম আবাদ করে জমির মালিকানা হস্তগত করা ‘বনকাটি’ জমিদারদের মধ্যে। রাধাকৃষ্ণ দাস প্রণীত, গোসানী-মঙ্গলকাব্যে (১৬৯৮) রংপুরে বন কেটে জমিদারী বসানোর উপাখ্যান রয়েছে। ‘ক্ষিতীশ

বংশাবলী' গ্রন্থ জানাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার এইভাবেই রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগরে রূপান্তরিত করেন।

কৃষি পরাশরের দার্শনিক প্রস্থান মনুষ্যকেন্দ্রিক আলোকায়নের ফসল নয়, বরং জগতে সকল জীবের সহাবস্থানের ভাবাদর্শিক পাটাতন, তাই সে নিদান দেয় 'কৃষিকাজে ভারবাহী পশুদের কষ্টের কোন কারণ যে না ঘটে, কারণ তাদের কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত ফসল ভোগ করা সকল রীতিতেই নিন্দনীয়' অথবা 'ভারবাহী পশুদের নিপীড়নের মাধ্যমে চতুর্গুণ ফসল উৎপাদিত হয় কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণে তা অচিরেই বিনষ্ট হয়।' এদেশের গ্রামসমাজে 'ধেনু'র গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝতেন, তাই তার 'উপেক্ষিতা পল্লী' নিবন্ধটি শুরুই হচ্ছে, এই বেদমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে- 'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণৌবি বঃ। অন্যোন্য মভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।।' (তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি করো।)

এই চেতনাই প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যপর্বতবেষ্টিত পশ্চিম সীমান্তের রাঢ়ের কূর্মক্ষত্রিয় কুড়মি জনগোষ্ঠীর 'বাঁধনা পরব' বা 'গোরুখুঁটা' উৎসবে। কালীপূজার তিথি কার্তিকী অমাবস্যায় ভূমিজ মানুষের এই খুঁটি পুঁতে 'গোরেয়া' দেবতারূপে গবাদি পশুর আরাধনা আয়োজিত হয়। ছাপা-সংস্কৃতির বর্হিবলয়ের স্মৃতিসভ্যতায় বাঙলা ব্রতকথার ঝাঁপিতেও থেকেছে 'গোকাল' ব্রত। যেটি পালিত হয় চৈত্র মাসের চরক সংক্রান্তির দিন, গবাদি পশুর সুস্থতার জন্য।

প্রাযুক্তিক প্রকৌশলের নির্মিতির প্রতি কৃষি পরাশরের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ, তা পুঁথির 'লাঙলের যন্ত্রাংশের বিবরণ' অংশটি পড়লেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের 'হলকর্ষণ'

অনুষ্ঠান বিষয়ক অভিভাষণটি দ্রষ্টব্য। যেখানে তিনি বলছেন- ‘আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।...যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট - যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।’

কৃষি পরাশরও একটি লিখন-অনুষ্ঠান, যা ‘তার পরে এল এক যুগ, তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে - আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।’ অভিভাষণের এই প্রতিপাদ্যটিকেই বাঙ্ময় করে তোলে কৃষি পরাশরে উল্লিখিত মন্ত্রাদির এহেন উচ্চারণে- ‘অভ্যন্তরে স্বর্ণভাণ্ডার সমৃদ্ধ, শেষনাগের সমৃদ্ধ, শেষনাগের উপর শায়িত এবং প্রাণী ও জড়বস্তু উপর শায়িত এবং প্রাণী ও জড়বস্তু সমূহের ধাত্রী হে ধরিত্রীমাতা আমাকে সমূহের ধাত্রী হে ধরিত্রীমাতা আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন।’

কৃষি পরাশরে জ্যোতিষ-অনুষঙ্গ প্রকট। এই কালিক অবস্থানকে বিকৃত বিজ্ঞানবাদীতার সরলরেখায় বিচার না করে, স্মৃতিনির্ভর পারম্পরিক প্রবাহমানতার জ্ঞানকাঠামোর

অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। যেভাবে খনার বচন জানাচ্ছে- ‘শুন কৃষকগণ। হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।। শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।। মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ। পূর্বদিক হতে কর হল চালন।। তাহলে তোর সমস্ত আশয়। হইবে সফল নাহিক সংশয়।।’ এই ধারার জ্ঞানতাত্ত্বিক অবয়বই, কৃষি পরাশরের গড়ন। তাই সেখানে নক্ষত্রাদির অবস্থান, রাশিফল ও গ্রহের সংলগ্নতা, কৃষিকাজে প্রায়োগিক নিদানের আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও, পুঁথিটিতে রয়েছে ‘রাম’ এর উল্লেখ, যা নেহাত কাকতালীয় নয়। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রামায়ণের উৎস কৃষি’ গ্রন্থটির ‘কৃষিশ্রী সীতা’ অধ্যায়টি পাঠ করলে জানা যায়- ‘অদিতি অর্থে পুনর্বসু নক্ষত্র; অন্য অর্থ অবিচ্ছিন্ন, ভূমি, পৃথিবী। বিষুবকালে দিন ও রাত্রি সমান হয়। ঐ নক্ষত্রে বৎসরের শেষ ও শুরু। এত কিছুর সমন্বয়ে ঋগ্বেদে অদিতি নক্ষত্রকে উপলক্ষ করে মূলতঃ পৃথিবীর মূরতিময়ী স্বরূপ সীতার বন্দনাই করা হয়েছে। সীতার এই প্রথম আবির্ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

‘শিকার, বনজসম্পদ আহরণ, আয়াসসাধ্য কৃষিকাজ এবং পশুপালন যাদের মুখ্য জীবিকা তাদের কাছে বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় গম যব ইত্যাদি রবিফসল ঘরে ওঠে। লক্ষণীয় যে একদা বৈদিক-যজ্ঞে যবচূর্ণের পিষ্ঠকের প্রচলন ছিল। এই পিষ্ঠকের নাম পুরোডাশ। সুতরাং বাসন্তবিষুবতে সীতার ভূয়সী স্তুতিতে তৎকালীন মানব সমাজের জীবিকার আভাষ পাওয়া যায়।....বাসন্ত-বিষুব যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তখন কালপুরুষ নক্ষত্রের ভূমিকা গৌণ। একারণে ধনু জনক বংশের পূর্বপুরুষের নিকট ন্যাসস্বরূপ প্রদান। কালক্রমে অয়নচলন হেতু বাসন্ত-বিষুব আরও পশ্চাদগামী হলে পুনর্বসু নক্ষত্র পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। কারণ তখন সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করলে শ্রাবণ মাস বর্ষাঋতুর প্রথম মাস

হিসাবে গণ্য হত। অতএব পুনর্বসু নক্ষত্রর শেষপাদে সূর্য এলে আগামী বর্ষার আশায় কৃষিকাজের প্রস্তুতি শুরু হত। কৃষিকাজের এই প্রস্তাবনাই হল জনকের যজ্ঞ।....কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠলে সীতার ব্যাপকতর স্বরূপকে সংকুচিত করে কৃষিগ্রীতে রূপান্তরিত করা হল। তখন সীতা হল সীরখাত, মেঘবর্ষণ দেবতার পত্নী। সীতার কৃষিশ্রী-সত্তা রামায়ণের মূল উপজীব্য। এই আবরণের অন্তরালে বাল্মীকি ঐতিহাসিক তথ্য রহস্যে ব্যক্ত করেছেন। রামায়ণে সীতাকে বারংবার রোহিণী নক্ষত্রর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণের কালে বৃষরাশিতে রোহিনী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের প্রথম মাস। বর্ত্তমানকালেও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কৃষিজীবিরা রোহিণী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল রয়োদশীতে 'রোণীপরব' উদ্‌যাপন করে। রোহিণী শব্দের অপভ্রংশ রোণী। অতি সাধারণ পরব, প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু পরবের ধরণ অনুসরণ করলে বুঝা যায় এর সঙ্গে কৃষিকাজ আরম্ভের যোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলের চাষীরা সূর্য রোহিণী নক্ষত্র অতিক্রম করে গেলে ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে অনাবৃষ্টি ও অনাবাদ আশংকা করেন। রোহিণী নক্ষত্র নিয়ে কৃষিজীবিদের এই ধ্যানধারণা অবশ্যই প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন করছে।' এ প্রস্তাবনা নস্যাৎ না করলেও, শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এই গ্রন্থের মৃদু সমালোচনা করে লিখেছিলেন 'সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গল পদ্ধতি - হলরেখা, ইহা অভিধান সম্মত, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না।

'ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন - সীতা = furrow of plough, সীতার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে রামকে এজন্য হলধর রাম সহ অভিন্ন কল্পনা করিতে হইয়াছে। সেই কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ বলা ব্যতীত উপায় ছিল না। নতুবা 'হলধর রাম' রামায়ণে অজ্ঞাত পুরুষ।

সুতরাং সঙ্গতি থাকে না। আমাদের গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'রাম' অর্থে 'মেঘ' কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনার মূলে আবেস্তার 'রামাহুর' ও আরবী ভাষায় 'রামা' শব্দ সহ রাম' শব্দের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া 'মেঘ' অর্থ সঙ্গতির চেষ্টা করিয়াছেন। (ইংরাজী Ram এবং Rum শব্দ দুইটি সহ কোন অর্থগত সাদৃশ্য না থাকায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই।)...'কৃষিশ্রী সীতা' এই প্রকরণে - বৈদিক মন্ত্রে সীতার উল্লেখ (ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল ৫ অঃ ৫৭ সূক্তে ৬৭ মন্ত্র) আছে। সীতা শব্দে লাঙ্গল পদ্ধতি বা 'সীতাধার কাষ্ঠ' অর্থাৎ লাঙ্গল বলা হইয়াছে। ইহা অভিধানেও উক্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। 'সীতা' শব্দের রূপক অর্থ সর্বস্বীকৃত। 'কৃষিশ্রী' অর্থটি তাহা হইতে টানিয়া আনিতে হইবে।

ইক্ষ্বাকুবংশ, কুশবংশ ও জনকবংশ - এই তিন অধ্যায়ে বহু কষ্টকল্পনা করা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই - জনক শব্দে 'বীজ' গ্রহণ করা হইয়াছে। জনক যদি 'বীজ' হয়, আর সীতা যদি লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে উৎপন্ন কৃষিশ্রী হয়, তাহা হইলে জনকের লাঙ্গল কর্ষণের ফলে বসুন্ধরা হইতে সীতার উৎপত্তি - এ অংশটি সঙ্গত হয় কি?'

এহেন তাত্ত্বিক কচকচানিতে যদি নাও যাই, যদি পুনর্বার রবীন্দ্রনাথেই ফিরি, তবে দেখব তার 'কবির অভিভাষণ: রক্তকরবীর প্রস্তাবনা' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২) এ তিনি বলছেন- 'নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা না আমার মত কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?....কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যই

সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?'

এই 'কেন'-র উত্তরটি বোঝার জন্য বৈশ্বিক কর্পোরেট পুঁজির স্থানিক মদতদাতাদের রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। 'বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন' (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রজতকান্ত রায়, রত্নলেখা রায়ের লেখা 'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গ্রাম বাংলায় গতিময় ধারাবাহিকতা: পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনুন্নত সমাজে প্রায়-স্থিত ভারসাম্যের আলোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, ১৯৬১ সালে ভারত সরকারের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক গ্রামে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত জল চল শূদ্রবর্ণ হিসেবে পরিচিত- সদগোপ, আগুড়িরা অথবা তাম্বুলি, শঙ্খবণিক, কৈবর্ত, তন্তুবায়দের মত পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের হাতে বৃহৎজমির মালিকানা ছিল, এবং বেশ কিছু জায়গায় তাদের 'জোতদার' বর্গভুক্তও করা হয়েছে। এহেন মালিকানা দ্রুত কোন জাদুকরী কৌশলে গায়েব হয়ে যায় তা আমরা আঁচ করতে পারি, ১৯৮৬ সালে ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে প্রকাশিত কৃষিবিশেষজ্ঞ প্রয়াত আর এইচ রিচারিয়ার, পরিবেশকর্মী ক্লদ আলভারেজ কর্তৃক নেওয়া সাক্ষাৎকারটি পড়লে। যেটি বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সঙ্ঘের মুখপত্র 'পরম' পত্রিকা পরম যত্নের সঙ্গে অনুবাদ করে ছেপেছিল। রিচারিয়ার সংগৃহীত প্রায় ৫০০০০ প্রজাতির ১৯০০০ দেশীয় বীজ, যা ছত্তিশগড়ের ইন্দিরা গান্ধী এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ও বহুজাতিক কৃষিসংস্থা সিনজেন্টার টানাপোড়েনের মাঝে হাপিস হয়ে যায়। নিখোঁজ হয়ে যায় কয়েক শতকের পারম্পরিক জ্ঞান, জীবনের 'বীজ'। রিচারিয়া সেই সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন কিভাবে

ভারতের ধান্যবৈচিত্র্যকে লুঠ করার পরিকল্পনা করেছিলেন মার্কিন মদতপুষ্ট গবেষক রবার্ট শ্যান্ডলার। আর বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত চাপানো ‘সবুজ বিপ্লবে’র অগ্রগামী সেপাই হিসেবে কাজ করেছিলেন স্বামীনাথনের মত কৃষি-আমলারা। রিচারিয়া আজীবন ছিলেন দেশীয় বীজ, কৃষিপদ্ধতি সংরক্ষণের পক্ষের মানুষ।

‘কৃষি পরাশর’ প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কালধ্বনি’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ছাপা হয়েছিল ‘বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘ’র মুখপত্র ‘পরম’ পত্রিকায়। অসীম ঔদার্যে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ‘পরম’ পত্রিকায় বঙ্গজ পূর্বজ কৃষিতাত্ত্বিক পরাশরের এই অসামান্য ইস্তেহার প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন জয়া মিত্রের অসামান্য ভূমিকা সহ। প্রত্যেককে প্রণাম জানাই।

কৃষি পরাশরের এই নবসংস্করণ বিষচাষ-বিরোধী, কৃষক স্বার্থ-বিরোধী, বিকেন্দ্রিভূতবাজার-বিরোধী জনমত গড়ে তুলুক।

উঠুক আওয়াজ খাদ্য-সার্বভৌমত্বের দাবীতে।

এই কামনা করি।

অত্রি ভট্টাচার্য

কৃষি পরাশর

বাংলা বাঙালির জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রজ্ঞান কৃষি বিজ্ঞানী পরাশর সম্পাদিত কৃষিজ্ঞানই কৃষি পরাশর নামে প্রখ্যাত। কৃষি পরাশর মূলত সংহিতা চরিত্রের। প্রথম অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছিল পরম পত্রিকার উপদেষ্টা, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কালধ্বনি পত্রিকায়। বাংলা জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে ছোট্ট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নথিটির অনুবাদ প্রথম প্রকাশের সম্মানে সম্মানিত কালধ্বনি। সেই অনুবাদ পরম পত্রিকার কৃষি প্রযুক্তি সংখ্যায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন কালধ্বনি পত্রিকার সম্পাদক মশাই। কৃষি-শাস্ত্রিক পরাশর, সংস্কৃত ভাষায় কৃষি বিষয়ক নীতিমালা লিখেছেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি নাগরী লিপিতে ছাপা কৃষি পরাশর পড়ে মনে হয়েছে, সেই সংস্কৃত অনেকটাই বাংলা-গন্ধী, ঠিক যেমনটি বাংলা-গন্ধী সংস্কৃত আমরা পাচ্ছি পূর্বের এক ভাবুক-তাত্ত্বিক ভগভট্টর লোহা, ইস্পাত, পারদ - বলাভাল বাঙালির রসায়ন জ্ঞানচর্চার তাত্ত্বিক সংহিতা রসরত্নসমুচ্চয়ঃএ। এই উদাহরণ থেকে আমরা মনেই করতে পারি পরাশর হয় বাঙালি না হয় পূর্বভারতের তাত্ত্বিক। কৃষি পরাশরের লেখক সে সময়ের কৃষিকর্ম, কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির যে বর্ণনা দিচ্ছেন, সেগুলি যতদূর সম্ভব পূর্বভারতীয় কৃষি প্রথা থেকে আহৃত। সেই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক বাংলাদেশের

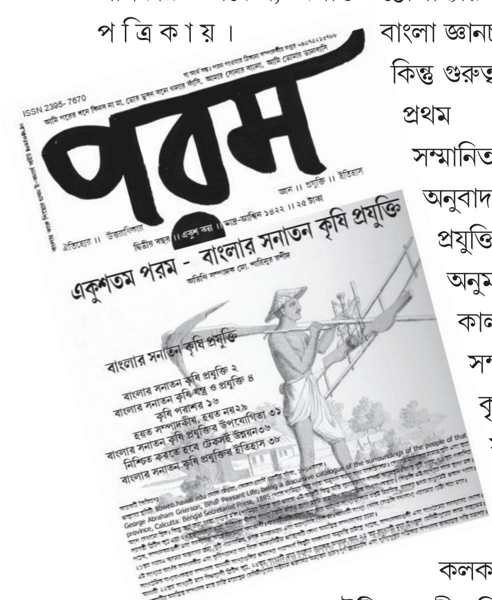

মো. শাহিনুর রশিদ পরম পত্রিকায় বাংলাদেশের কৃষিকর্মের যে সব যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিচ্ছেন, তার কয়েকটি কৃষি পরাশরে উল্লিখিত হয়েছে যেমন মই। ১৬০০ বছর আগে লেখা এই নীতিমালায় বহু কৃষি আচার আচরণ আজও বাংলার অনেক পরম্পরা সমাজে পালিত হয়। দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজের নবান্ন বা লবান প্রথার হুবহু মিল পাওয়া যায় কৃষি পরাশরের বর্ণনায় (শেষেরটি চেখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন জয়া মিত্র, লবান বা নবান্নের সময় তাঁকে আমরা দিনাজপুরের মুস্কিপুর গ্রামে নিয়ে যাই)। আরও একটি কথা, কৃষকদের জন্য, কৃষির প্রাচুর্যের জন্য নানান নক্ষত্রের যোগ, তিথির, বারের কথা বিশদ উল্লেখ করেছেন পরাশর অবলীলায়। তিনি মনে করছেন না, সে সব জটিল আঙ্কিক তত্ত্ব কৃষকদের জানা বা জানানো বাহুল্য মাত্র, কৃষককে সে সব বিশদ তত্ত্ব জাননো জরুরি নয় — কেননা তারা অশিক্ষত, অবোধ, চাষা - তাদের জন্য তত্ত্বকে শুধু সাধারণ (মেড ইজি) বোধ্য ভাষার চালু সংকেতগুলিই উপস্থাপন করলেই যথেষ্ট; আজ যেমন তথাকথিত সাধারণের জন্য কোনও কিছু গভীর বিষয় লিখতে গেলে, কিছুটা তরল করে লেখার প্রবণতা শুরু হয়েছে। পরাশর সেই রাস্তায় হাঁটছেন না। বোঝা যায় যে কৃষিও সে সময় বিপুল জ্ঞানচর্চার অংশছিল (আজও রয়েছে), এবং সে সময় নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশদে চর্চিত হত কৃষক সমাজে, যা প্রায় অঙ্ক করার সামিল। পরম পত্রিকার কৃষি প্রযুক্তি সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলার প্রাচীনতম কৃষি সংহিতা - কৃষি পরাশর জ্ঞানগঞ্জের ১৭তম পুথি হিসেবে ছাপতে গেল। কৃষি পরাশরের অনুবাদ, প্রকাশের কাজে যুক্ত থাকা প্রত্যেককে আন্তরিক প্রণাম, শুভেচ্ছা।

বইতে ব্যবহার করা ছবির একাংশ জর্জ গ্রিয়ারসনের বিহার পেজেন্ট লাইফ থেকে আর একাংশ কোলসওয়ার্দি গ্রান্টের বেঙ্গল রুরাল লাইফ থেকে নেওয়া

"সুবর্ণ রৌপ্যমাণিক্য দুর্মূল্য বসন আদিতে যিনি সজ্জিত, তাঁকেও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কৃষকের কাছে প্রার্থী হতে হয়।"

এই সরল কারণটির জন্যই ঋষি পরাশর সেই কৃষককেই রাজার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান একমাত্র ভূ-পতি বলে বর্ণনা করে তাঁর কৃষিকর্মের শাস্ত্র শুরু করেন, যেহেতু অন্য সকলেই অন্নের জন্য কৃষকের কাছে প্রার্থী কেবলমাত্র কৃষক কারো কাছে অন্নপ্রার্থী নন। মাত্র ২৪৩টি শ্লোকে রচিত এই শাস্ত্রে এদেশের প্রাচীন ও সমৃদ্ধতম জীবিকা কৃষিকাজের এক সযত্ন বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করেন 'কৃষকাণাং হিতার্থায়'।

কৃষি যে একটি যান্ত্রিক কাজমাত্র নয়, প্রকৃতির মধ্য থেকে মানুষের নিজের খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য যে অতি জটিল ও সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাসমূহ লক্ষ্য করতে, বুঝতে ও অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে অভ্যাস করতে হয়েছে, এই অভিজ্ঞতা 'কৃষি পরাশর'-এর অ-কৃষক পাঠককেও স্তব্ধ অভিভূত করে রাখে। বহুকাল ধরে নানাজনের মনে এক অপূর্ণতার অনুভূতি ছিল এরকম যে আমার এই দেশের প্রাচীন কোন জীবনচর্চার কোন স্পষ্ট বিবরণ, লিখিত বা অন্য কোনরকমে সংরক্ষিত, নেই। 'কৃষি পরাশর'-এর প্রতিটি শ্লোকে কৃষিকাজের নানা অংশে চমকপ্রদ সব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল এত সরল ও মধুর ভাষায় থরে থরে সাজানো আছে যেন তা আমাদের আগ্রহের উত্তরে অতি সরস সুস্বাদ ফলের এক অসামান্য বাগান।

যেমন মহাজন বাক্য, 'পণ্ডিতেরা বিবাদ

করুন লয়ে তারিখ সাল', আমরা মন দিই না ক'জন পরাশর, এই কৃষি পরাশরের রচয়িতা এক ও অভিন্ন কিনা 'পরাশর সংহিতা ও 'পরাশর স্মৃতি' রচয়িতা(দের?) সঙ্গে। বরং শিরোধার্য করে নিই এই বিচার যে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের এই রচনাধারা ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী নয়।

আর একথা মানবার জন্যও বিশেষ তথ্য প্রমাণের অপেক্ষা করি না যে সজল শ্যামল এই 'ধান্যকৃষি' যা জ্যৈষ্ঠা আষাঢ়ে বীজ বপন করে জমিতে 'মই' দিয়ে শুরু করে পৌষ মাসে নতুন অন্নপাক সকলের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে ধান কেটে গোলায় করা পর্যন্ত — এ বাংলারই কৃষিবিবরণ। অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করি না কেননা 'নাড়িতে যে রক্ত বহে/সেও যেন ওই ভাষা জানে'। শিকড়ে শিকড়ে এত বাঁধা আছে জীবনের মানে যে মনে হয় সবখানি বড়ো পরিচিত, আজকের জীবনের সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য ধারাবাহিক। 'অন্নং প্রাণাং অন্নং বলং অন্নং সর্বার্থসাধনম' অনেক শত বছর পেরিয়ে যখন বেজে উঠবে আমার দশকে আমারই কবির কণ্ঠে 'অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা/অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা' নিমেষে

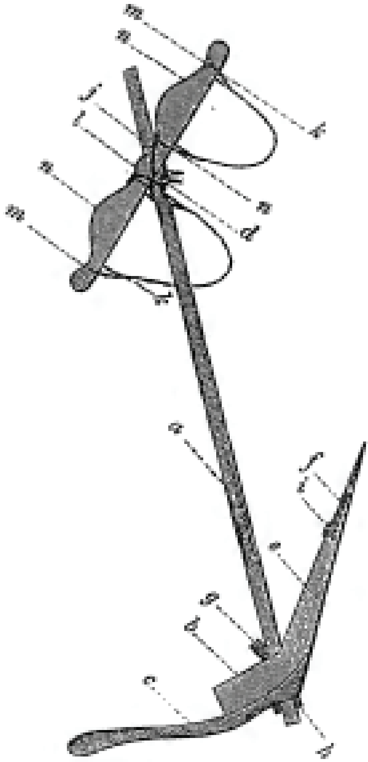

প্রায় হাজার বছরের এপার ওপার জুড়ে এক সেতুবন্ধ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি নিজের সংস্কৃতির ভূমি খুঁজে পাই। সন্ধান পাই কোথায় প্রোথিত আছে শেকড়। চার দশক ধরে প্রতিদিন 'পিছিয়ে পড়া কৃষিব্যবস্থা' লাঞ্ছনা দেগে দেয়া ভারতের কৃষকের মুখ দীপ্ত দেখা যায় সেই দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিকতায়। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বলা 'ভারতীয় কৃষি ইতিহাসের বয়স অন্তত দশ হাজার বছর' এই বিবৃতির শিরায় শিরায় প্রাণ দপদপ করে ওঠে।

'অন্ন ধান্য হইতে জাত, ধান্য কৃষি বিনা হয় না সুতরাং অন্য সব পরিত্যাগ করে সযত্নে কৃষিকাজ করা কর্তব্য'।৭। প্রথম শিক্ষার্থীকে শেখানোর মত সদয় যত্নে পরাশর নিজের উপদেশ আরম্ভ করছেন। আমরা অবাক হয়ে দেখি সবচেয়ে অমোঘ কারণটিকে সবচেয়ে সরলভাবে তুলে দিচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে। পাঠ শুরু হচ্ছে 'কেন কৃষি' সেইখান থেকে। যদিও প্রথম শ্লোকেই বলা আছে 'কৃষকাণাং হিতার্থায়' বলা

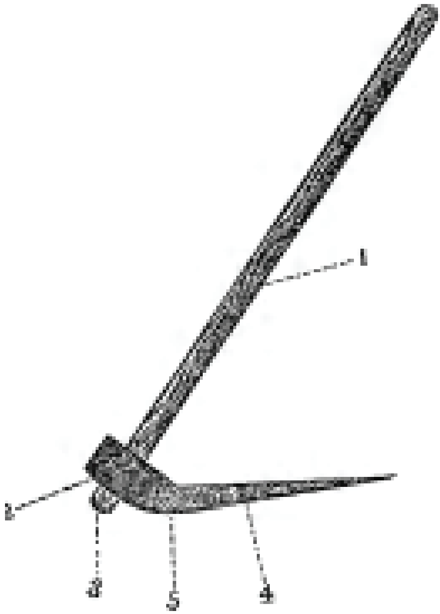

হচ্ছে এ সকল উপদেশ তবু মনে হয় আমাদেরই মতন অর্বাচীন কোন সংশয়কে কি নিরস্ত করতে পরাশর ঋষিকেও? তখনও কি কেউ বলেছিল 'কৃষির কী দরকার, শিল্পই তো সমৃদ্ধি দেবে'? 'ভাতরুটি যদি কম পড়ে কেকপিৎজা খেয়ে নিলেই হবে' বলেছিল কোন উন্মার্গগামী? নাকি এ শুধু আমারই কালোদিনের সংশয়, প্রকৃতপক্ষে ঋষি শেখাচ্ছিলেন কেবল ক্ষুধার যুক্তি নয়, ভিক্ষা না করার, প্রার্থী না হবার মর্যাদা? এমন তো হতে পারে না ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অথবা যে কোন শতাব্দীতেই রাজশাসন ব্যতিরিক্ত কোন সমাজে বাস করতে পেরেছিলেন ঋষি পরাশর, তবু কোন ভূ-স্বামীকে নয়, যিনি মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করেন, যিনি সেই মহাঘটনার নিয়মাবলী নিত্য অভ্যাস করে অন্ন সৃষ্টি করেন, তাকেই এমনকী সুবর্ণমাণিক্যমণ্ডিত ধনীর চেয়েও বড়ো মহিমায় স্থাপন করছেন তিনি।

কী শেখাচ্ছেন পরাশর তাঁর শাস্ত্রে? আমরা খেয়াল করতে পারব যে কৃষির যেসব মূল অভ্যস্ত কাজ অর্থাৎ মাটি চষা, সেচ, ফসল কীভাবে কাটতে, ঝাড়াই-মাড়াই করতে হয়, কীভাবে সার দিতে হয়, কেমন ভাবেই বা প্রস্তুত করতে হয়

শস্যগোলা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই প্রায় বলছেন না তিনি। যেন শিক্ষক জানেন যে কোন কোনটা তাঁর ছাত্রদের শেখাবার প্রয়োজন নেই, কী কী তাঁরা দীর্ঘ অভ্যস্ততায় জানেন। ঠিক যেমনটি বাংলার রান্নাঘরে কেউ শেখাবে না ভাত ঠিক কেমন ভাবে রাঁধতে হয়। পরাশর ঋষি উপদেশ দিচ্ছেন মূলত আরও ভালো কৃষিকাজের জন্য যে সকল নিয়মগুলি আয়ত্ত করা দরকার অথবা যে যে বিষয়ে কৃষকের অনবধান আসতে পারে – ঠিক সেই সকল বিষয়ে।

ছোট গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় তার নির্দেশের প্রধান বিষয় বুঝি – যত্ন। যে কাজ নিত্য অভ্যস্ত তার সম্পর্কে সচেতন, মনোযোগ আর নিরীক্ষণে যত্ন নেওয়া। প্রকৃতির নিজস্ব ভাষায় বলা যে অজস্র কথা চারপাশে নিত্য ফুটে ফুটে উঠছে – সেই ভাষাকে সযত্নে পড়ে নেওয়া। সেই ভাষারই বিস্তার মধ্যরাত্রে গাছের পাতায় শিশির জমা না-জমা থেকে, বাতাসের কিংবা মেঘের দিক নির্ণয় থেকে পিঁপড়ের ডিম মুখে যাত্রা কিংবা হঠাৎ ব্যাঙের ডাক পর্যন্ত। হয়ত বিশেষত

ধান্যকৃষি বলে, হয়ত বা বিশেষত বাংলা কিংবা পূর্ব ভারত বলে, 'বৃষ্টিনির্ভর (বৃষ্টিমূলাং কৃষি ও বৃষ্টিনির্ভর জীবন'-এর উল্লেখ করলেন আগের মতই সরল প্রত্যক্ষতায়, তারপর কিন্তু জলরফা বা সেচব্যবস্থার মত ব্যবহারিক কোন বিষয়ের বদলে

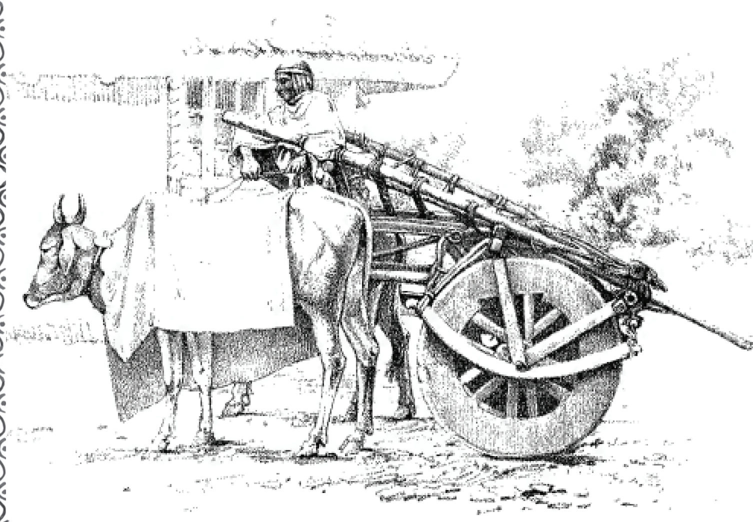

চলে গেলেন অনেক মূল জায়গায়, বৃষ্টি হবে কি হবে না, কম হবে কি বেশি — সেই অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞানের লক্ষণবিচার শেখাতে শুরু করলেন বিস্তারিত, বিস্তারিত ভাবে। চার রকমের মেঘ আবর্ত সংবর্ত পুষ্কর ও দ্রোণ। এদের কার কেমন বৃষ্টিপাতের ধরণ — একদেশেন আবর্ত সংবর্ত সর্বোত জলম। পুষ্করে দুষ্কর বারি দ্রোণে বহুজলা মহী।২৫। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের বিভিন্নতার যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে তা চিহ্নিত করে সেই বিভিন্ন বৃষ্টিদাতা মেঘের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে শুরু হল 'বৃষ্টিমূলাং কৃষি'র পাঠ। অনেন মানেন তু বৎসরস্য/নিরূপ্য নীরং কৃষিকর্ম কার্যম এইভাবে সম্বৎসরের জলের পরিমাণ নির্ণয় করে নিয়ে কৃষিকাজ আরম্ভ করবে। ২৮। এবং তারপর সেই প্রতিমাসের বৃষ্টিলক্ষণ বিচার। প্রতিটি মাসে বৃষ্টি হবে কি হবে না, কিরকম থাকবে রৌদ্রতাপ, ফসলের ওপর কী হতে

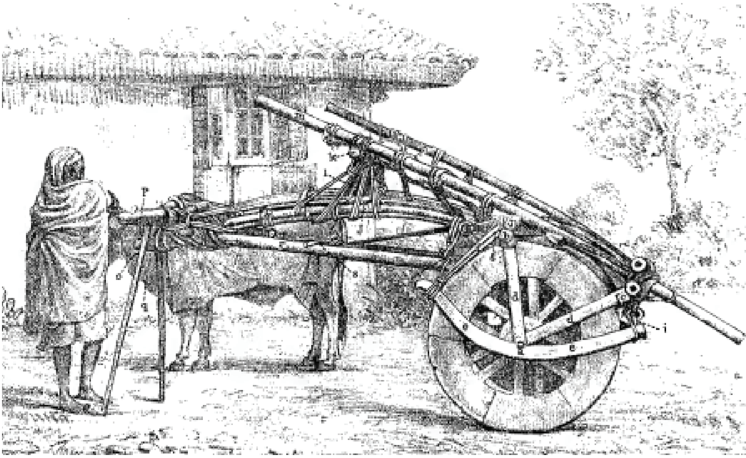

পারে তার প্রভাব — প্রত্যেকটি মাস ধরে ধরে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় পঞ্চান্নটি শ্লোকে বিস্তৃত এই বিবরণের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মেঘের পরিচয় ছাড়াও কুয়াশা বাতাস বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদি নানান লক্ষণের কথা, এমনকী এই হিসাবও যে (বর্ষণের দেবতা) ইন্দ্র সর্বদাই বর্ষণ করেন দশভাগ সমুদ্রে, পাঁচভাগ পর্বতে আর পৃথিবীতে (সমতলে, ধান্যক্ষেত্রে?) করেন চারভাগ ।

এইসব লক্ষণের বিবরণ দেবার সময়ে, পরে বীজ বপন, ধানচারা রোপণ অর্থাৎ তুলে বসানো এমনকী ফসল কাটা পর্যন্ত যে কথা পরাশর ঋষি সবচেয়ে বারবার বলেন তা হল গ্রহনক্ষত্র সূর্যচন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থানের হিসেব। বস্তুত এই হিসেব এই ছোট বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই লেখক বিবেচনা করেছেন বলে মনে হয়, এবং এই জায়গাগুলিরই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আজকের আধুনিকমনস্ক যুক্তিবাদীদের অনেকের সংশয় থাকে এবং এই সমস্ত বিষয় এমনকী শব্দবন্ধসমূহও অনেকের কাছেই ‘অবৈজ্ঞানিক’ ‘কুসংস্কারপূর্ণ” বলে মনে হয়। বেশিদূরও যেতে হবে না, সযত্নসম্পাদিত বইটির ভূমিকা লেখক স্বয়ং বলছেন

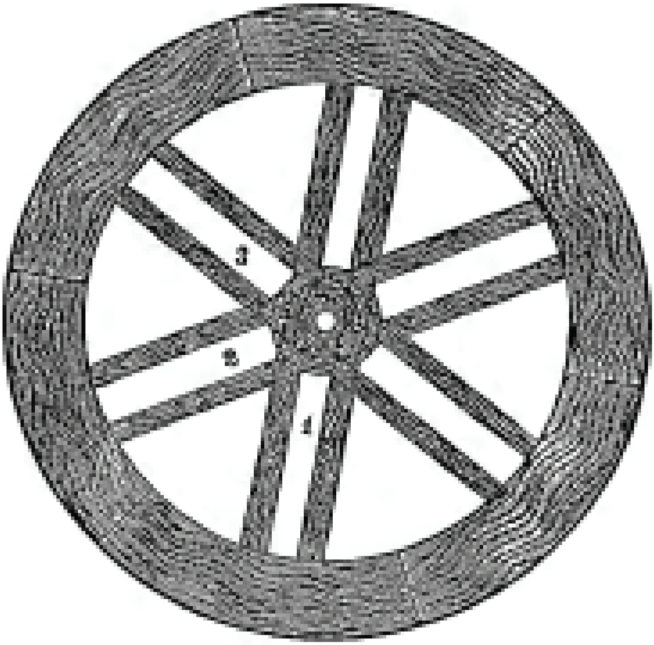

'... regarding the influence of the planets and the stars on rainfall and the various agricultural operations. One may legitimately question the accuracy of these observations which, however, should not be rejected outright so long as they are not tested by competent persons in the proper scientific manner.'

কেউ যদি প্রশ্ন করেন কী সেই 'উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী' যা দিয়ে 'যোগ্য ব্যক্তিরা' এই প্রাচীন গ্রন্থটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের 'প্রামাণিকতা পরীক্ষা করে দেখবেন'? এই 'অপ্রামাণিক' 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' (superstitious) বলে মনে হবার একটি প্রধান কারণ কি নয় আমাদের একরৈখিক 'বিজ্ঞান' ও আধুনিকতার ধারণা? গ্রহতারানক্ষত্রের উল্লেখমাত্রে, প্রাচীন

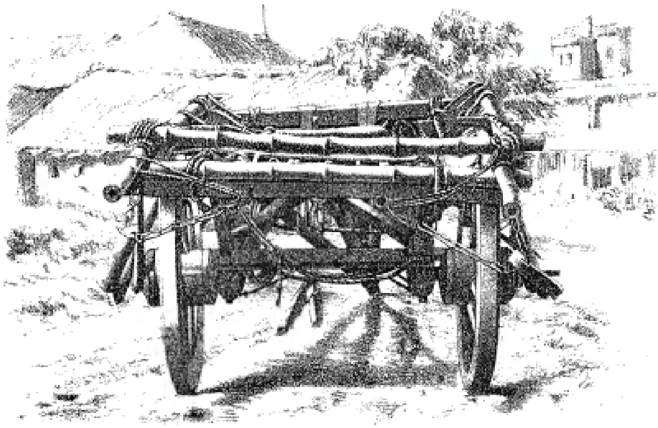

শাস্ত্রে উল্লেখমাত্রে যে সেই বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার সংস্কার টাল খায় তার একটি বড়ো কারণ নয় কি আমাদের জানার সীমাবদ্ধতা? সেই বিখ্যাত কৌতুকটির মত আমরা হারিয়ে ফেলা চাবিটি খুঁজি কেবলমাত্র আলোকস্তম্ভটির তলায় কারণ একমাত্র সেই জায়গাটিই আমি দেখতে পাচ্ছি। তার বাইরে সবই অন্ধকার এবং সেখানে আলো জ্বালবার কোন উপায়ও আমি জানি না।

এ দেশে অনেককাল ধরে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বলা হয় সামুদ্রিক বিদ্যা। হাতের রেখা পাঠ বা কোষ্ঠিবিচার অথবা টিয়াপাখি দিয়ে ভাগ্যগণনাই আজকে আমাদের কাছে জ্যোতিষবিদ্যার চেহারা। কিন্তু ভারতবর্ষের মত এক বিরাট ভূভাগের উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে রওনা হওয়া একের পর এক জাহাজ যখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কি নিউজিল্যান্ডে পৌঁছাচ্ছিল তার অন্তত এক হাজার বছর কি তারও আগে ভারতের বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর থেকে নৌকা ও অর্ণবপোত (সমুদ্রগামী জলযান) সুমাত্রা যবদ্বীপ বোর্ণিও সিংহল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপরাজ্যগুলির সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য করেছে। ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটেছে পরস্পরের মধ্যে। তারই

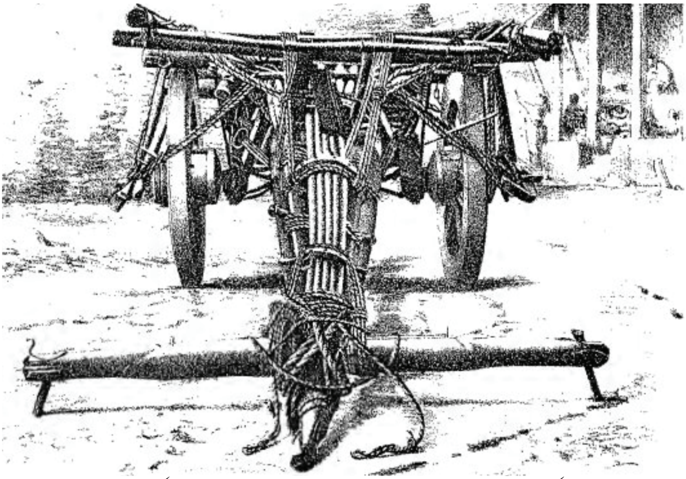

এক পর্যায়ে রাজা অশোকের মগধ থেকে ধর্মমহামাত্যরা বোধিবৃক্ষের শাখা বা চারা নিয়ে এক বিরাট অঞ্চলের মহাসমুদ্রস্থিত দ্বীপরাজ্যসমূহে যাচ্ছেন।

এইসব সমুদ্রপোত পথ হারিয়ে এদিক ওদিক চলে যাওয়া, অন্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছানোর উপাখ্যান বা বিবরণ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বরং বিন্ধ্যপর্বতকে নমিত অবস্থায় রেখে দক্ষিণভারতে চলে যান যে অগস্ত্য মুনি, বিন্ধ্যকে মাথা তুলতে না দেবার জন্য তিনি আর দাক্ষিণাত্য থেকে স্বভূমিতে ফিরে আসেন না। কীভাবে সেই পুরাকালে দক্ষিণসমুদ্র পার হয়ে ছোট ছোট দ্বীপে পৌঁছে বিশ্বাস ও বাণিজ্য করেন তিনি তার বিবরণ দিয়ে অতিসুন্দর এক গাথা বিবরণ প্রচলিত আছে দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতে তার সারা বিবরণীটির নাম 'অগস্ত্যারা'। কী করে সমুদ্রের সেই 'উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই' নিস্তরঙ্গ নীলকালো বিস্তারের মধ্যে পথ চিনত এই জলযানগুলি? একটাই উত্তর, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে। এই 'দেখা' নিশ্চয়ই কেবল চোখে তাকিয়ে দেখা নয়, গভীর ও জটিল পর্যবেক্ষণ থেকে অবশ্যই কোন গণিতশাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে থাকবে। (হয়েছিল

যে, কেরালার প্রাচীন সামুদ্রিক গণিতবিদ্যা আজও তার সাক্ষ্য দেয়।)

দিনের বেলা সমুদ্রে কোন পথের দিশা নেই, সূর্য সাধারণভাবে দিকনির্দেশ করে মাত্র। সত্যকারের উদ্দিষ্ট দিক ও পথ তো লেখা থাকে রাত্রির আকাশে। কিন্তু কী সেই বিদ্যা যা দিয়ে মহাশূন্যে জেগে থাকা ওই উজ্জ্বল অক্ষরমালার পাঠোদ্ধার হবে? হয়ত সেই পথের দিকচিহ্ন হিসাবেই তৈরি হয়েছিল তারকামণ্ডল জুড়ে জুড়ে আঁকা ছবির রাশিচক্র। আকাশ গম্বুজের মাঝবরাবর সূর্যচন্দ্র চলার যে মহাপথ। অন্য প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতির্বিদ যাকে বললেন জো-ডি-আর্ক তারই আশপাশ ধরে বিরাজমান এই রাশিচক্র। একটি রাশির বিভিন্ন নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থিতির হিসাব ধরে এক ভিন্ন পথনির্দেশ। সেই রাশিচক্রের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক বছরের বিভিন্ন সময়ে, রাত্রির ভিন্ন ভিন্ন যামেও নিজেদের অবস্থান বদলায়। তখন চন্দ্রসূর্যের অবস্থান, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক কৌণিক দূরত্বের নির্দেশিকাই তো আকাশে ভাসমান মানচিত্র। মাসে, ঋতুতে, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে

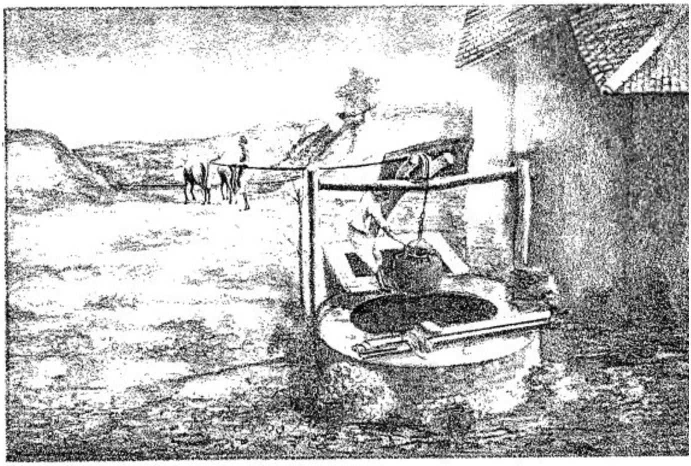

বিভাজিত হিসাব। সেই এক অকূলের মানচিত্র দেখে যখন আর এক অকূলের পোতবিন্দুগুলির যাত্রাপথ নির্ণীত হয়, তখন জ্যোতির্বিদ্যাকে আর কী বলা হবে সামুদ্রিকবিদ্যা ছাড়া?

তারপর যেমন প্রায় সকল বিদ্যাতেই কোন না কোনভাবে ক্ষমতা তার নিজস্ব মৃগয়াক্ষেত্র বার করে নেয়, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে এক জ্যোতিষবিদ্যা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও তার নিয়মিত প্রয়োগের পাশাপাশি অনিশ্চিত ভবিষ্যতভীত মানুষের জায়গা করে নিয়েছে গ্রহরত্ন- স্বস্ত্যয়নের সংস্কার। এই সরলীকৃত জাদুবিদ্যার আশ্রয় যদি হয় কিছু মানুষের ভীতু দুর্বল কিংবা লোভী মন, তার দায় শাস্ত্রের নয়। সেরকম দুর্বল মানুষ সমাজে তখনও ছিল, এখনও আছে। নানান বানিয়ে তোলা উচ্চাশার 'যা চাও তাই' প্রতিকার বিধায় জ্যোতিষচর্চা এখন যেমন এক বৃহৎ ব্যবসা হয়ে উঠেছে, প্রাচীনকালে হয়ত এতটা ছিল না। ঠিক সেই একই ভাবে তিথিনক্ষত্রের হিসাব করতে হত কৃষিকাজের জন্য। যে অদৃশ্য বৃক্ষটি নিহিত থাকে এতটুকু বীজের মধ্যে, ভূমি জল উষ্ণতা আর্দ্রতা বাতাসের ঠিক কোন যোগাযোগে তা রূপ ধরবে, সেই শাস্ত্র পড়তে হত খোলা মাঠের মাঝখানে

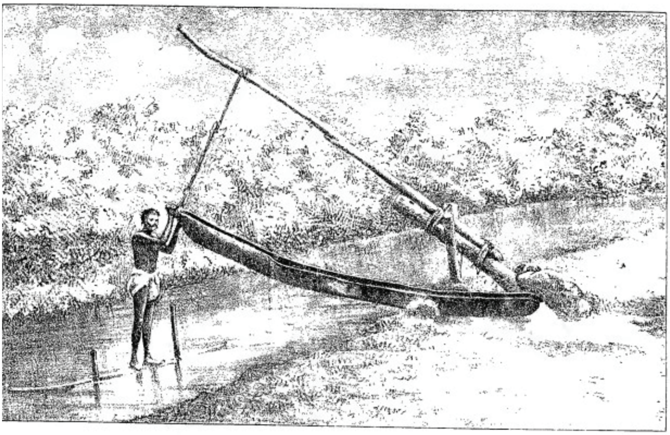

দাঁড়িয়ে। একবার যদি ভাববার চেষ্টা করি — ছোট্ট একটি শুকনো বীজ, মাটির গর্ভে উপ্ত হয়ে কোন চাপে, তাপে, আর্দ্রতায়, ঠিক কতদিনে নিজের ভিতরে সঞ্চিত প্রাণ থেকে একটি অঙ্কর ও তার খাদ্য, দুই-ই জাগিয়ে তুলতে পারে, সেই প্রাণকণাটি সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে কী মৃদুভাবে মাটিকে ভেদ করে একটি বা দুটি সুগঠিত বীজপত্র প্রকাশ করে, মাটিরস আর কী অসম্ভব দূরে থাকা এক সূর্যের কতোটুকু আলো নিজের ভিতরে নিয়ে সৃষ্টি করে নিজেই নিজের রং গড়ন গঠন পুষ্টি। কেমন করে সে একটি গাছ হয়ে ওঠে, কতো লক্ষ লক্ষ জটিল নিয়ম সংহত হয়ে একটি বীজ থেকে এক হরিবর্ণ চারাগাছের জন্ম দেয়, সেই পরমরহস্য পাঠের নিয়ম আমি জানিনে। মাটির গোপন অগ্নি জ্বলে ওঠে ধানচারা হয়ে।

সহজতার এমন মায়াময় আবরণে সমস্তটা আবৃত যে তাকে খেয়াল পর্যন্ত করতে পারিনে, সে তো আমারই দীনতা ওই গ্রহনক্ষত্র ঋতুতিথি দিবসরাত্রিই কি নয় সেই পুঁথি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভূমিসন্তানরা যেখানে জমা করছিলেন কখনও বা পাঠ করে নিচ্ছিলেন নিজেদের জ্ঞান? কখনো তার নাম খনার বচন, কখনো ভদ্‌লি পুরাণ, কখনো পরাশর সংহিতা বা কৃষি পরাশর। গ্রীক ভাষা যদি আমি না জানি, বুঝতে না পারি, তবে

কি সেই ভাষাটি কুসংস্কার হয়ে যায়? 'আমি যতোটা জানি, তার বাইরে আর কিছু নেই, আমার জানাই বিশ্বপ্রকৃতির সীমা' এই ধারণার বাইরে দাঁড়িয়েই প্রজ্ঞার সেই আত্ম উপলব্ধি 'জ্ঞানসমুদ্রের তীরে আমি নুড়ি কুড়োচ্ছি কেবল'।

কী বিচিত্র, কী বিপুল, পরস্পরের সঙ্গে কী গভীর সম্পর্কে জড়ানো সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মে ছন্দোবদ্ধ ভাবে এই পৃথিবী চলছে, তার ব্যাপকতার কিছুটা আন্দাজমাত্র করতে পারলে তবে নিউটন হওয়া যায়। তখন কিছু গবেষণাপত্রে আগুন লাগিয়ে ফেললে ডায়মন্ডের ওপর আর কোন আক্রোশ হয় না। অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যে দীন সীমাবদ্ধতা তা আমারই বোঝা সেই গবাক্ষ দিয়ে দেখলে পৃথিবী অনেকখানি রয়ে যায় বে- াধেরও বাইরে। তখন আমি যা বুঝতে পারি না তা কুসংস্কার, আমি যা দেখিনি তা নেই এবং আমার সীমায়িত গুহার জীবনই মানবজীবনের সার্থকতার মাপকাঠি।

পরাশর ঋষি তাঁর রচিত শ্লোকের পর শ্লোকে কৃষককে শেখাচ্ছেন অদ্ভুত সব অনুপুঙ্খ। প্রতিমাসের বৃষ্টিলক্ষণ শিক্ষা দেবার পর কৃষির প্রস্তুতির জন্য আরও বিস্তারে শেখাচ্ছেন 'একটি দিনের পাঁচদণ্ডকে মাসের প্রতিনিধি হিসাবে ধরলে

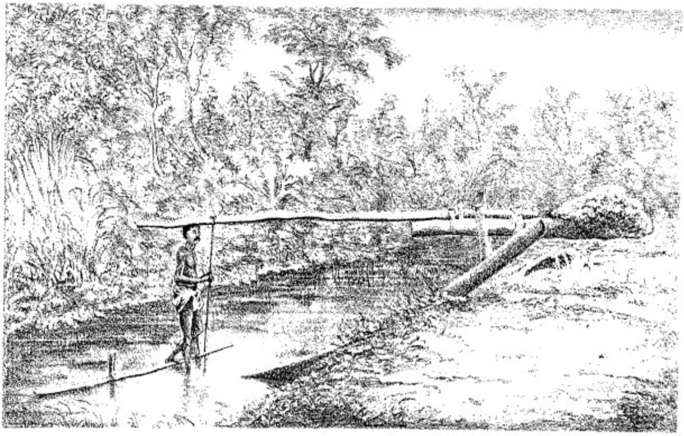

প্রথম দিকের বৃষ্টি দিনের ও অপরাহ্নবেলার বৃষ্টি রাত্রের (বৃষ্টিপাত) নির্দেশ করবে।' ।৩২। বিশ বছর আগেও পুরুলিয়ার বরাবাজারে গ্রামবৃদ্ধদের পৌষমাসের প্রথম সাতদিন সূর্য ওঠার আগে জঙ্গলে গিয়ে রাত্রে গাছের পাতার ওপর শিশির ও ধুলোর নানান অনুপাত দেখে সারা বছরের গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের আগাম নির্ণয় করতে দেখেছি। বীরভূমে, উজ্জয়িনীতে, অসমের শিবসাগরে কৃষক আজও হাতে করে ধুলো উড়িয়ে দেখেন কতক্ষণ পর বৃষ্টি হবে, হবে কি না নিশ্চিত বলতে পারেন এবং এই সব নিয়ম তাঁরা খুব স্বাভাবিকভাবেই জানেন। ফলে 'পৌষমাসে যদি কুয়াশাচ্ছন্ন বৃষ্টিপাত হয় তবে (পরবর্তী) সপ্তম মাসে মহী বারিপূর্ণ হবে।' ।৩৪। কিংবা 'পৌষমাসের শুক্লপক্ষে যদি আকাশ মেঘাবৃত হয় তবে সংবৎসর ধরিত্রী জলপূর্ণা হবেন।' ।৩৫। এরকম সব নিরীক্ষণ যে নিছক জ্যোতিষসুলভ ভবিষ্যদ্বাণী নয়, তা বোঝা যায়। যাঁরা এ শাস্ত্র জানতেন তাঁদের পঠনভাষা আমরা জানি না, এ কথাই কেবল সত্য হয়ে থাকে। এ কথা আলাদা যে আজকে বাতাস যে পরিমাণ ধোঁয়া ধুলো কটুবাষ্পে বোঝাই তাতে আশ্বিন পৌষ বৈশাখ নির্বিশেষে আকাশ ধূমাবৃত থাকে, অধিকাংশ শহর, কোন কোন গ্রাম অঞ্চল থেকেও চাঁদের সিত - অসিত, শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষ ঠাহর হয় না এবং ছিন্নজঙ্গল মহীতে

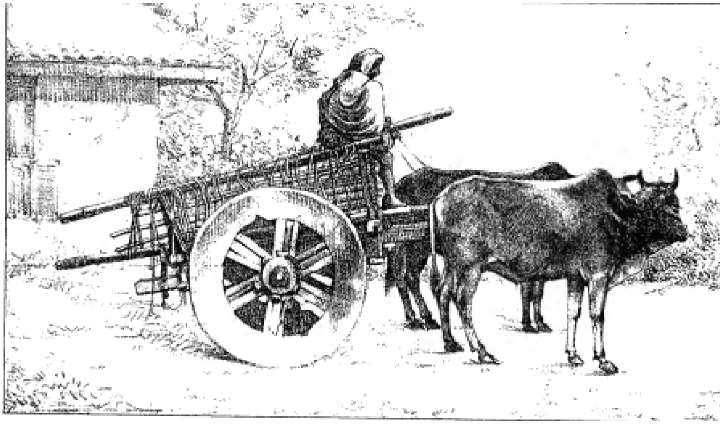

অবশিষ্ট গাছগুলির পাতা সর্বদাই বড়ো অসহায় ধুলোয় ঢাকা। শিশিরের কোনো লিপি আর পড়া যায় না সেখানে।

পরাশরের অঞ্চল ও কাল নির্ণয়ের জন্য বিশেষজ্ঞরা যে সব বিষয়ে জোর দিয়েছেন তার মধ্যে একটি যদি হয় তাঁর ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবন্ধ রচনা, অন্য একটি প্রধান লক্ষণ তবে কৃষিতে পশু হিসাবে কেবলমাত্র বলীবর্দ বা বলদ ব্যবহারের উল্লেখ। যদিও ভারতের বহু জায়গায় কৃষি-পশু হিসাবে মহিষ বা ঘোড়ার ব্যবহার হত, কেবল বলদের উল্লেখ থেকে অনেকেই মনে করেন পরাশর ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের লোক ছিলেন। যেহেতু বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' তে পরাশরকে "জ্যোতিষাচার্য ও পশুবিজ্ঞানবেত্তা বলে প্রশংসা করছেন, বরাহমিহিরের রচনা গদ্য নিবন্ধ সম্ভবত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বলে মনে করা হয়, কাজেই কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন পরাশর ষষ্ঠ শতাব্দী বা তারও আগেকার কৃষিবিজ্ঞানী। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অবশ্য পরাশরকে স্থাপন করছেন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে। এই কালবিচারের প্রশ্ন উঠল এ জন্য যে বৃষ্টির পূর্বাভাসে প্রাণীদের ব্যবহার (সাপের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা, ডিম মুখে পিঁপড়ের সারি,

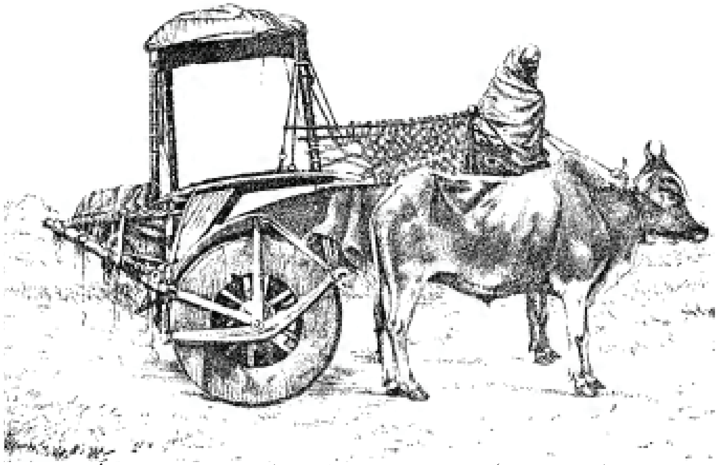

হঠাৎ ব্যাঙের ডাক ইত্যাদি), লাঙলের বর্ণনা, চাষের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বলদ চেনবার লক্ষণের মত বহু বিষয় এই চোদ্দ'শ বছর পরও ধারাবাহিকতায় প্রাসঙ্গিক রয়ে গিয়েছে।

যে সব শিক্ষার কারণে বরাহমিহিরের মত প্রখ্যাত জ্যোতিষাচার্য ঋষি পরাশরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করছেন তাঁর বৃহৎসংহিতায় (পৃ ১৯ কৃ.প.) সেইগুলিই আচার্য পরাশর শিক্ষা দিচ্ছেন 'কৃষকায়া হিতার্থেন'। শেখাচ্ছেন লাঙলের (হল) আটটি অঙ্গের অনুপুঙ্খ পরিচয়। আমরা পুলকিত হব দেখে যে কীভাবে বহু পরে, বিংশ শতাব্দীতে, সেই একই যত্নে, শিক্ষিত বাঙালিকে হলপরিচয় করাচ্ছেন অন্য মেধাবী শিক্ষকেরা। দেখাচ্ছেন স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার আঠারোটি জেলায় লাঙলের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা, যা নির্ণীত হত মাটির চরিত্র ও কৃষির ফসল অনুযায়ী। পরাশর, যাঁকে একইসঙ্গে জ্যোতিষাচার্য ও পশুবিজ্ঞানবিদ বলছেন বরাহমিহির, মেঘ ও বৃষ্টিশাস্ত্র শেখাবার পর শেখাচ্ছেন কীভাবে কৃষির উপযুক্ত সুস্থ, সবল পশু চিনতে হয়। একইসঙ্গে, কিংবা হয়তো অধিক বিস্তারে, শিক্ষা দিচ্ছেন কৃষিপশুকে যত্ন করার নিয়মাবলী। গোশালা কতখানি বিস্তৃত হলে গোরু সচ্ছন্দ থাকে, পিতলের জলপাত্র ব্যবহার না

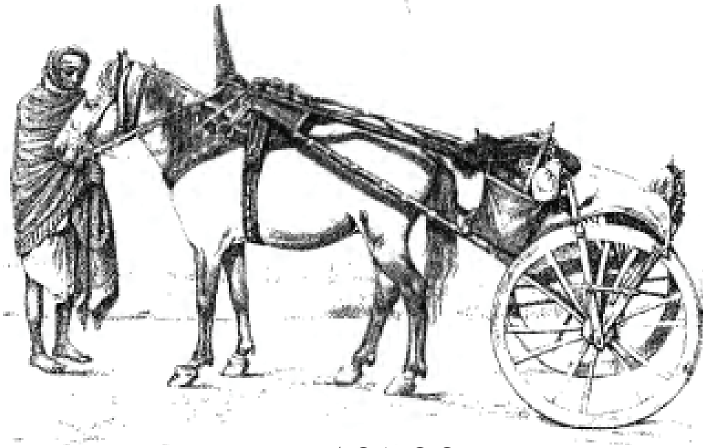

করা, গোয়ালে নোংরা বা উচ্ছিষ্ট জিনিস না রাখা, গোরুকে অপরিষ্কৃত না রাখা ইত্যাদি যত্নের নানান নিয়ম। মনোযোগ দেবার নানান ক্ষেত্র। তাই যথেষ্ট নয়, বলা হচ্ছে চাষের পশু ক্লান্ত হবার পরও যদি কৃষক তাকে দিয়ে চাষ করায়, তাহলে চতুর্গুণ বেশি ফলন হলেও তাতে কৃষকের ভালো হবে না।৮।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ক্ষেতে হল নামাবার যে নিয়মাবলী তার তিথি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে ইন্দ্র শুক্র পৃথু ও পরাশরকে বন্দনায় জাগ্রত করে।১৩৫-১৩৮।, বায়ু ও অগ্নির স্তব করে।১৩৯। বসুমতীর কাছে প্রার্থনা করতে হবে সুফলনের জন্য।১৪০। অর্থাৎ কৃষি যে কেবল প্রস্তুত ক্ষেত্রে বীজ দেয়া ও নিজের গোলায় ফসল তোলার ক্রিয়ামাত্র নয়, জীবজগৎ ও প্রকৃতির আরও বহু ছোটবড় প্রসারিত শক্তির সঙ্গে এ জড়িত সেই সচেতনতা ছাত্র পাঠকের মনে বারবার গেঁথে দেয়া হচ্ছে।

চাষ শুরুর মুহূর্তে যে সব ঘটনা ও লক্ষণ এবং তার ফলাফলের কথা বলা হয়েছে 'কৃষি পরাশর'-এ তার বেশ কিছু কৃষিসমাজে এখনও মানিত। এগুলো সংস্কৃতির অঙ্গ। হল বাঁকাভাবে চালানোর দরুণ সারি বাঁকা হয়ে গেল কি না, প্রথম

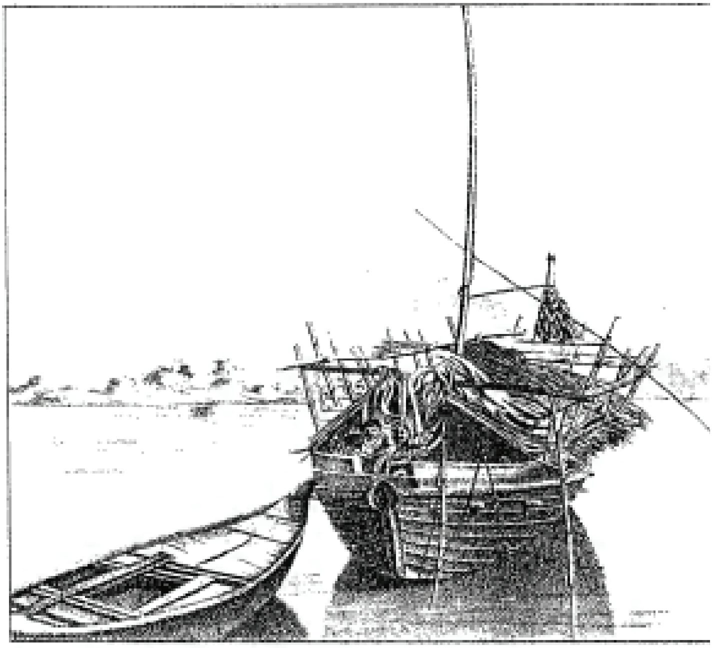

হল টানার সময় বলদ(গুলি) জিভ দিয়ে নাক চাটল কি না, এ সকল শুভ অশুভ লক্ষণ, পুরো গ্রাম জড়ো হয়ে একাগ্রভাবে সেই ঘটনা লক্ষ্য করে। অ-লক্ষণে চিন্তা ও শুভ লক্ষণে আনন্দ ধ্বনি করে ওঠে। সেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নীরস ঘটনা উল্লেখ ও বিশ্লেষণে এই আচরণের সাংস্কৃতিক প্রকাশ বোঝা সম্ভব নয়।

কৃষি একগুচ্ছ যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র নয়, ধান ক্ষেত প্রকৃতপক্ষে নয় ধান তৈরির কারখানা, গ্রামের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবনার শহরবাসী মানুষ প্রায়ই সে কথা বুঝতে পারেন না। তাছাড়া, যে ভাবনা ও জীবনযাপনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব, তার সর্ববিষয় আমি দৃষ্টিপাতমাত্রে বুঝতে পারব, তা সহজেই আমার ধারণা ও জানা দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলা যাবে এও কি নয় একরকম অ-বিনয়? একরকম বুদ্ধি-দম্ভ? কোনটা সংস্কার, কোনটা কু-সংস্কার, সে বিষয়ে আমার মাপকাঠিই কি একমাত্র মাপদণ্ড?

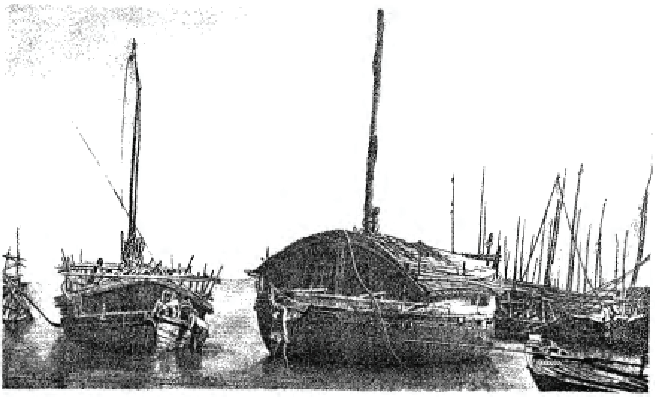

তাহলে ব্যক্তি বা সমাজকে জানবার, এমনকী জীবনের অর্থ বোধ করার পথে যে নিত্য দ্বিধার সংকট, যেখানে কোন জ্ঞানই শেষ পৃষ্ঠা নয়, যেখানে সত্য কেবল এই কথাই যে কিছুই চিরন্তন সত্য নয়, সবই নিমেষে নিমেষে পরিবর্তনশীল কী হবে তাহলে সেই দ্বিধাদীর্ণ অনিশ্চিতির? ওই অনিশ্চিতিই মানুষকে স্থিতি দেয় না, রহস্য থেকে গভীরতর রহস্যে চালনা করে। চারিপাশে যা নতুন তা এমনকী প্রাচীনকে অন্যভাবে দেখবার পথও নির্দেশ করে কখনও কখনও। শিকড়ের দিকে যাবার পথ। যেমন, দুর্গাপুজোর তিন মাস আগে থেকে বাজার পাগল হয়ে অপ্রয়োজনেও নতুন নতুন পোশাক কেনা বা যে কোন শহরের যে কোন ভাষাভাষী শিশুর জন্মদিনে কেক কেটে, বেলুন উড়িয়ে যদি সামাজিক আনন্দের বিষয় হয়, নির্দিষ্ট পুজো উপলক্ষে গয়না কেনা যদি প্রচারের জোরে সহজেই ঐতিহ্যপালন হয়, তাহলে সাঁওতাল মুণ্ডা মাহাত কুর্মি সমাজে পনের দিন কি এক মাস ব্যাপী গো- বন্দনার শেষে ‘খুণ্টলেডেক’ পরবে কার্তিক অমাবস্যার দুদিন পর গ্রামসুদ্ধ সকলের গোরু এক জায়গায় জড়ো করে দিয়ে মাটিতে রাখা মুরগির ডিমটি কার গোরুর পায়ের চাপে ভাঙল, তাহলে গ্রামের সমস্ত লোকের বাঁধভাঙা আনন্দ-উত্তেজনা, নাচগান, খাওয়াদাওয়ার উৎসব কুসংস্কার হবে কেন?

সন্তানহীনা/বন্ধ্যা নারীকে শস্য উৎসবে বা বীজরক্ষণ উপলক্ষে বর্জন করা খুবই অসমর্থনীয়। সত্যিই 'কু'সংস্কার। এ ধরণের কাজ কোন মানুষকে অকারণে ব্যথা দেয় বলেই তাকে দোষণীয় মনে করা হয়। কিন্তু আজকের 'শিক্ষিত' সমাজেও ত্বক-এর গৌরত্ব-অগৌরত্ব নিয়ে যে উচ্চকিত ছুঁতমার্গ তাকে কি আরও বেশি নিষ্ঠুর 'কু'সংস্কার বলে বুঝতে পারব না?

প্রাচীন সাহিত্য বা শাস্ত্র সম্পর্কে প্রায়ই এরকম ভাবনা শোনা যায় যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের, অগ্নি বৃষ্টি বসুমতী নদী ফসল আদির যত প্রশংসা শোনা যায় তার সবই স্তুতিবাক্য। সবই ভয়ে ভক্তি। কিন্তু যখন দেখি ধানবীজ পেকে ওঠার পর প্রথম আড়াই মুঠি ধানসুদ্ধ গাছকে বড়ো যত্নে, আদরে বরণ করে মাথায় করে নিয়ে নিজগৃহে সসম্ভ্রমে বহন করা, ফসল কেটে নেবার আগে সেই জমিতে সকলে সমবেত হয়ে একসঙ্গে নানান সুখাদ্য খাওয়া, পরস্পরকে গভীর সৌহার্দ্যে যত্ন করা, হর্ষিত হওয়া, পরস্পরের সমৃদ্ধিতে আনন্দে পূর্ণ হওয়া প্রথা হিসাবে স্বীকৃত হয়, উৎসবে খাদ্য পরিবেশনকালে প্রথম স্থানটি কোনো ভূস্বামীর, কোনো ক্ষমতাশালীর নয় বরং বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ মানুষের বলে স্বীকৃত থাকে; সেই যত্নশীল, মূল্যবোধসম্পন্ন সাধারণ জীবনচর্যার বিবরণ অন্তত এই কথাটি প্রকাশ করে যে ধান বা শস্য কেবল পণ্য বা ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনীয় উপাদান মাত্রই নয়। ধান অর্জনের যে জটিল ও দীর্ঘ সব নিয়ম, প্রকৃতি ও মানুষের যে যৌথ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি শস্যগুচ্ছ পরিণত হয়ে ওঠে, তাকে নিজের ভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়ার আগে অংশভাক মানুষ, প্রাণী ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে সেই শ্রী ও সমৃদ্ধির আনন্দকে ভাগ করে নেওয়ার এক তৃপ্তিময় প্রথা ছিল। এমনকী অপ্রাণী হাল-লাঙল-কোদাল-কাস্তে-নিড়ানিকেও টেনে পুকুরে নিয়ে, স্নান করিয়ে তেল সিঁদুর পরিয়ে দেন সাঁওতালরা তাদের সহরাই উৎসবে। আজও সেই সব প্রথা নবান্ন বিহু বিসু সহরাই খিচুড়ি সংক্রান্ত এমন নানা নামে নানা জায়গায় জীবন্ত আছে।

এই দেশের সভ্যতা আজও পাঁচ-সাত - দশ হাজার বছরের উত্তরাধিকারকে অনেকখানি জীবন্তভাবে বহন করে চলে সমাজের শিরায় শিরায়।

যে 'আর্য' শব্দ বহুকাল ভারতে বিশেষ সম্মানসূচক ছিল তার মূল অর্থ তো 'যিনি চাষ করতে সক্ষম'। 'অর্' ধাতু অর্থে লাঙলের ফলা চালনা। 'অর্'-এর এই অর্থ ইংরিজী 'aurable' অর্থাৎ চাষযোগ্য (জমি) শব্দে এখনও স্পষ্ট প্রচলিত। অর্থাৎ কৃষিকাজ জানা এ দেশে সম্মানের বিষয় ছিল। সে প্রসঙ্গে মনে হয় 'অনার্য' শব্দটি ভুল দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয় কারণ ওই শব্দে যাদের বোঝানো হয়, সে সব জনগোষ্ঠী চাষ জানতেন আরও আগে।

এই ছোট অথচ অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বইটির সম্যক বিশ্লেষণী আলোচনা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এখানে কেবল বলার চেষ্টা রইল কোন প্রয়োজন বোধ থেকে গ্রন্থটির একটি সরল বাংলা অনুবাদ এই পত্রিকায় সাদরে প্রকাশ করলাম। ছিন্নমূল উদ্বৃত্ত এক ভাসমানতার বোধ পৃথিবীর নগরে নগরে মানুষদের অনেককে একরকম বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যেন মানুষ বাস করছে কেবলমাত্র মুহূর্তের তাৎক্ষণিকতায়, যেন ব্যবহারিকতা ছাড়া অন্য কোন মূল্য নেই তার, মূল্যবোধ নেই। নেই ঐতিহ্য, পরম্পরা, লালনময় কোন ভবিষ্যৎ। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মানুষ তাই আবার খুঁজছে নিজের শেকড়। পরস্পরকে বার্তা দিচ্ছে সেই প্রাপ্তি ও অস্তিবোধের। স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে যাওয়ার বদলে এই তার বসত।

ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগে যারা তার সহযাত্রিণী ছিল, গ্রীস রোম মেসোপটেমিয়ার মত প্রাচীন সভ্যতা সব, তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অতীতবিচ্ছিন্ন নবরূপে স্থাপিত রয়েছে আজ। সেই তুলনায় পুবের দেশগুলির উৎপাদন, জীবনযাপন ও সংস্কৃতি অনেক বেশি ঘনসংবদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে।

হয়ত এই নৈকট্যই এ সব দেশকে দিয়েছে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভর করে এখানকার মানুষ বারবার পরাজয়কে পরাস্ত করেন। হতাশার মধ্যেও চারা রোপণ করেন, তাতে অন্য রঙের ফলফুল ফোটে। পঞ্চাশ কী একশ বছরের তালিকা মেলানো দারিদ্র্যের চেয়ে অনেক হাজার বছরের প্রাচীন রিক্ততার সঙ্গে সহবাস এখানকার সংস্কৃতি।

'কৃষি পরাশর' আমাদের সমাজের সেই ধারাবাহিকতার বোধকে স্পর্শ করে। দেড় দু'হাজার বছর ধরে প্রবাহিত এক সংস্কৃতির পরিচয় পরতে পরতে খুলে যায় আর অপরূপ উদ্ভাসে জেগে ওঠে নতুন নতুন অর্থ আমাদের কিছু বা পরিচিত, কিছু আধা-অপরিচিত হয়ে যাওয়া নানা চিহ্নে। আজও যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে প্রকৃতিকে উপাস্যের জায়গায় বসাতে অভ্যস্ত মানুষের সংখ্যা এদেশে অনেক বেশি। মানুষের একমাত্র বাসভূমি বলে যে 'হালকা নীলের বিন্দু' গ্রহটিকে চিহ্নিত করেছিলেন কার্ল সাগান, সেখানকার ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম জীব-উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ-শৃঙ্খলার যে জটিল, অ-পার সম্ভব অপূর্ব আন্তঃসম্পর্কের জাল, তাকে এখানকার ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজের নিজের মত করে অর্চনা করেন, সেই শক্তিরহস্যের প্রকাশসমূহের সামনে প্রণত হন। নিজেকে সেই শৃঙ্খলার অন্তর্গত বলে বোধ করেন।

এখানে ধর্ম তাই সংস্কৃতির অন্তর্গত। আজও আমাদের বিরাট আদিবাসী সমাজ চাঁদ-সূর্য অরণ্য ও পর্বতরাজির অর্চনা করেন। উত্তর পূর্বের অরুণাচলে মানুষ আচরণ করেন ডয়নি-পোলো (সূর্য-চন্দ্র) কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, মণিপুর বিশ্বাস রাখে অর্ধসরীসৃপ-অর্ধপ্রাণী আদিদেব পাখাম্বা ও পবিত্র পুকুরে, মহারাষ্ট্র রাজস্থান গুজরাট অরণ্যকে সৃষ্টিরক্ষাকারী শরণ্য দেবতা বলে জানে। সারা ভারতবর্ষ এখনও কার্তিক মাসে কৃষি-পশু ও গৃহপালিত পশুদের বিশেষ যত্ন করে, বন্দনা করে,

হেমন্তের সেই অমাবস্যায় চারণের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয় পশুদের। সারা দেশ পৌষের সংক্রান্তি দিনে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকল পরিজনকে নিয়ে নতুন ফসল খাওয়ার উৎসব করে। উৎসব করে চাঁদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নানান নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করতে যাওয়া নিয়ে। এমন সহস্রপাকে আমাদের সংস্কৃতির নাড়ি আজও বাঁধা প্রকৃতির সঙ্গে। অচ্ছেদসম্ভব সম্পর্কে। কৃষি পরাশরের বিবরণ অ-কৃষিশিক্ষিত জনকেও আজও বেঁচে থাকার শিকড় চিনিয়ে দেয়। পংক্তিতে পংক্তিতে খুলে দেখায় প্রথার ভিতরে সজ্জিত তার স্বরূপ, যখন প্রকৃতি সযত্নে সসম্ভ্রমে আদর করার সম্পদ ছিল, যখন সৌন্দর্যকে প্রসাদ বলে সম্মান করার সংস্কৃতি ছিল, বিশ্বপ্রকৃতি কেবলমাত্র মানুষের কাজে লাগার দীন উপাদান হয়ে পড়েনি।

জয়া মিত্র

কৃষি পরাশর

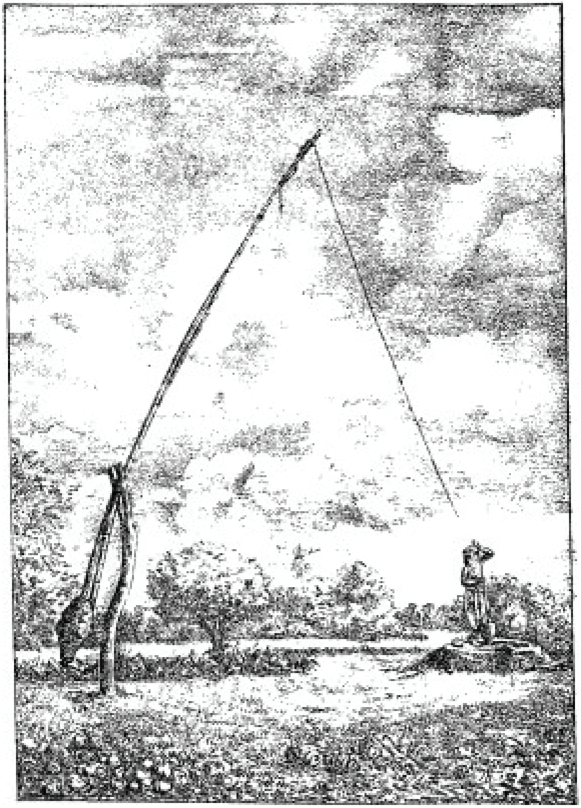

অথ কৃষি পরাশর

(১) 'প্রজাপতি'কে প্রণাম করে ঋষি পরাশর কৃষকগণের হিতার্থে কৃষিকাজের মঙ্গলের কথা বলতে শুরু করলেন।

(২) বিচক্ষণ শাস্ত্রবিদ, চতুর্বেদ যাদের কণ্ঠস্থ এবং যারা শাস্ত্রের কথা জানেন ও জ্ঞানী তারা মঙ্গল প্রার্থনা করেও

অলক্ষ্মী লাভ করতে পারেন।

(৩) শুধুমাত্র কৃষিকাজের ভিতর থেকে উঠে একজনারই, কারোর বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ থাকে না। কেবলমাত্র কৃষিকাজের দ্বারাই পৃথিবীতে একজন সার্বভৌম রাজা হতে পারেন।

(৪) সুবর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য ইত্যাদি সম্পদ-প্রাচুর্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীও, তণ্ডুল সামগ্রীর জন্য কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল।

(৫) হাত কান গলায় স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত মানুষকেও অন্নের অভাবে অনাহারে থাকতে হতে পারে।

(৬) অন্নই পুষ্টি, জীবনীশক্তি; অন্নই জীবনের সর্বার্থ সাধন করে; দেবতা, দানব ও মানবকুল সকলেই অন্ননির্ভর।

(৭) ধান হইতে অন্নের সৃষ্টি, ধান কৃষিকাজ ভিন্ন পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে কৃষিকাজ প্রয়োজন।

(৮) কৃষিকাজ আশীর্বাদ, কৃষিকাজ পবিত্র; কৃষিই সমগ্র জীবগণের জীবন । ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণের দোষও অতিথি সৎকার দ্বারা খণ্ডিত হয়।

(৯) যিনি অতিথি সেবা করেন বাস্তবিক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর সম্মানে সকলে সম্মানিত হন এবং ঈশ্বর পূজাও হয়।

ঋষি পরাশর আরও বলেন

(১০) সমস্ত কৃষিকাজে বৃষ্টিপাতই মূল কথা; জীবনেরও মূলাধার। সুতরাং বৃষ্টিপাত সম্পর্কীয় ব্যবহারিক জ্ঞান যত্ন করে অর্জন করা প্রয়োজন।

(১১) অতএব বৃষ্টিপাত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই বৎসরের দেবতার রাজা ও অমাত্য এবং মেঘ ও জলের পরিমাণ মাপক 'আধক' সম্পর্কীত বিদ্যার্জনের প্রয়োজন।

বৎসরের দেবতার রাজাকে জানিতে হইবে

(১২) 'শক' বৎসরকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ২ যোগ করিয়া তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা ভাগশেষ হইবে তিনিই 'রাজা'। সংখ্যাতত্ত্বে রাজা থেকে চতুর্থ সংখ্যা মন্ত্রী বা অমাত্য হইবেন।

(১৩) 'সূর্য' যদি রাজা হন, তবে মধ্যম বৃষ্টিপাত; 'চন্দ্র' (রাত্রি দেবতা) অতিবৃষ্টি। 'মঙ্গল' – অল্পবৃষ্টি, 'বুধ' (চন্দ্রের সন্তান) – সর্বোত্তম বৃষ্টিপাত।

(১৪) বৃহস্পতি – উত্তম বৃষ্টিপাত; শুক্র – সর্বোত্তম এবং 'শনি' – অনাবৃষ্টি অর্থাৎ খরা।

(১৫) যে সংবৎসরে সূর্য রাজা ফলে চক্ষুরোগ, জ্বরাদি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা স্বল্প বৃষ্টি, প্রবল বায়ু প্রবাহ।

(১৬) চন্দ্র রাজা নীরোগ, প্রচুর শস্যাদি, সকলের নিমিত্ত সুখ।

(১৭) মঙ্গল রাজা – বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, শস্যাদি বিনষ্ট হয়, পৃথিবীতে শস্যাভাব লক্ষিত হয়।

(১৮) বুধ রাজা – রোগ-ভয় হীন। শস্য প্রাচুর্য।

(১৯) বৃহস্পতি রাজা সর্বোত্তম বৃষ্টিপাতের জন্য শস্য শ্যামল বসুন্ধরা, প্রচুর সম্পদের অধিকারী।

(২০) শুক্র (দৈত্যগুরু) রাজা সর্বসময়ে বহু রাজন্যবর্গকে

সম্পদশালী করেছেন। শস্য প্রাচুর্য পৃথিবীকে সম্পদশালী করে।

(২১) শনি রাজা পৃথিবী সংঘর্ষ, দুর্বিপাক, সংবৎসর ঝঞ্ঝাশঙ্কুল।

(২২) বৃষ্টিপাতের পরিণতির সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে সংবৎসরের রাজার সহিত এবং রাজা যখন মন্ত্রী হইবেন উভয় ক্ষেত্রেই বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানীজনকে সুবিদিত হইতে হইবে।

মেঘ সম্পর্কে গণনা

(২৩) (শক বৎসর + ৩) ÷ ৪ এবং ইহার ভাগশেষ হইতে মেঘের 'আবর্ত' শুরু হয়।

(২৪) আবর্ত, সংবর্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ এই সকল মেঘকুল পর্যায় অনুযায়ী বর্তমান।

(২৫) আবর্ত – অঞ্চলকেন্দ্রিক, সংবর্ত সর্বকেন্দ্রিক, পুষ্কর – স্বল্প এবং দ্রোণ - প্রচুর বৃষ্টিপাত।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারণ

(২৬) ঋষিগণের উক্তি – 'আদক' ১০০ যোজন চওড়া এবং ৩০ যোজন গভীর।

(২৭) যখন সূর্য কর্কট রাশি অতিক্রম করে এবং মিথুন, মেষ, বৃষ এবং মীনে চন্দ্রের অবস্থান থাকে তখন বৃষ্টিপাত ১০০ আদক হয়। সূর্য ধমুতে অর্ধেক বৃষ্টিপাত (৫০ আদক), সূর্য যখন কন্যা, বৃশ্চিক

রাশিতে ৮০ আদক বৃষ্টিপাত।

(২৮) কথিত আছে – সূর্যের অবস্থান যদি কর্কট, কুম্ভ, বৃশ্চিক ও তুলা রাশিতে হয় তবে ৯৬ আদক বৃষ্টিপাত হবে। কৃষিকাজ শুরুর পূর্বে সংবৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(২৯) কথিত আছে ইন্দ্র দশমাংশ সাগরে, ষষ্ঠাংশ পর্বতে, চতুর্থাংশ মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাত দান করেন।

পৌষে বৃষ্টিপাতের জ্ঞান

(৩০) জ্ঞানীজনেরা পৌষ মাসের প্রথম আড়াই দিনের বাতাসের গতিপথ লক্ষ্য করে বৃষ্টিপাতের গণনা করতে পারেন।

(৩১) উত্তর বা পশ্চিমা বাতাস হলে বৃষ্টিপাত এবং পূর্ব বা দক্ষিণা বাতাস হলে খরা। বাতাস না থাকলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, বাতাস মোটামুটি থাকলে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত।

(৩২) পাঁচ 'দণ্ড'কে মাসের দিনের একক ধরা হয়। প্রথম দিকের বৃষ্টিপাত দিবাভাগে এবং পরের দিকের বৃষ্টিপাত রাত্রিকালীন হয়।

(৩৩) একটি পতাকায় দণ্ড বাঁধিয়া দিবা রাত্রির প্রয়াসে বাতাসের গতিপথ নির্ণয় করিলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

(৩৪) পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে ধূলিকণাপূর্ণ শুভ্র বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত পশ্চিম দিগন্ত নির্দেশিকা দেয় পৃথিবী জলপূর্ণ হবে।

(৩৫) পৌষ মাসে যদি বৃষ্টিপাত বা কুয়াশা লক্ষিত হয় তবে পরবর্তী সপ্তম মাসে পৃথিবী জলপূর্ণ হবে।

(৩৬) পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে

সেই বৎসরে পৃথিবী জলপূর্ণ হবে।

(৩৭) মীন ও বৃশ্চিক রাশিতে যদি বৃষ্টিপাত হয় তবে পরবর্তী সপ্তম চান্দ্রমাসে পৃথিবীতে প্লাবনের সম্ভাবনা।

মাঘ মাসে বৃষ্টিপাতের সম্যক জ্ঞান

(৩৮) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তম দিনে যদি বৃষ্টিপাত বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে সেই সংবৎসর পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়।

(৩৯-৪০) মাঘ বা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তম দিনে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে যদি বয় প্রবল বাতাস অথবা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হয়, তবে বর্ষাকাল স্থায়ী হয়, পৃথিবী হয় শস্যপূর্ণ।

(৪১) মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তম দিনে স্বাতী নক্ষত্রে যদি বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত সহ আকাশে বিদ্যুৎপ্রভা লক্ষিত হয় তবে কার্তিকের শেষাবধি বৃষ্টিপাত।

(৪২) যদি মাঘে শিলাবৃষ্টি সহ প্রবল বেগে অবিরাম বৃষ্টি, ফাল্গুনে আকাশে মেঘ সহ প্রবল বাতাস, চৈত্র মাসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বৈশাখে নাগাড়ে শিলাবৃষ্টি ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রখর রৌদ্র হয় তবে সূর্য তুলারাশি অতিক্রম না করা অবধি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হইবে।

ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত জ্ঞান

(৪৩) যদি সূর্য মকর রাশিতে থাকে এবং রোহিণী নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিন হইতে পাঁচ দিন ব্যাপী যথাক্রমে দুর্বিসহ, খারাপ, মাঝামাঝি, প্রবল ও অতিশয় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

চৈত্র মাসের বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত জ্ঞান

(৪৪-৪৫) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন যদি হয় রবিবার, সংবৎসর মধ্যম বৃষ্টিপাত; সোমবার – পৃথিবীর মৃত্তিকা ভেসে যাবে প্রবল নিরবচ্ছিন্ন ঝোড়ো বৃষ্টিপাতে। মঙ্গলে যথেষ্ট বর্ষণ নয়; বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রে শস্যপ্রাচুর্যে পূর্ণ বসুন্ধরা; শনিতে এমনকি সমুদ্রও শুষ্ক, পৃথিবী অদৃশ্য ধূলার মেঘে।

(৪৬) চিত্রা নক্ষত্রে চৈত্র মাসের প্রথমাংশে মধ্যম, শেষাংশে স্বল্প এবং মধ্যমাংশে প্রবল বৃষ্টিপাত।

(৪৭) মুলা ও ভরণী নক্ষত্রে সমগ্র দিন ও রাত্রিতে বাতাস প্রবহমান থাকিবে। সঠিকভাবে জানিবে আর্দ্রা নক্ষত্রে বৃষ্টিপাত সুনিশ্চিত।

(৪৮) বৃষ্টিপাত বুঝিতে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে প্রবহমান নদীচরে একটি মাস্তুল পুঁতিতে হইবে।

(৪৯) মনে মনে 'ওঁ সিদ্ধি' (কৃতকার্য হইবার মন্ত্র) দুই শত বার জপ করিয়া মাস্তুলটিতে নিশানা চিহ্ন দিতে হইবে। তারপর ঐ নিশানা পর্যন্ত পুরোপুরি নদীর জলে ডুবাইতে হইবে।

(৫০) বৃষ্টিপাতের পরিমাপ জানিতে হইলে হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া মাস্তুলের নিশানায় জলের উচ্চতা লক্ষ্য করিতে হইবে।

(৫১) যদি উচ্চতা একই থাকে তবে বৃষ্টিপাত ও বন্যা পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় বৃষ্টিপাত ও বন্যা পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় একই হইবে এবং কম হইলে বৃষ্টিপাত ও বন্যা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কম হইবে।

(৫২) যদি উচ্চতা বেশি হয় বৃষ্টিপাত ও বন্যা দ্বিগুণ হইবে। ইহাই ভবিষ্যতের বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত ঋষি পরাশরের উক্তি।

(৫৩) চৈত্র মাসের শেষ দিন, বিষুব সংক্রান্তিতে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে করতে যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করবে, সেই সময়কাল যদি সূর্যোদয়ের সময় হয় তাহলে পৃথিবী জুড়ে বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে, মধ্যাহ্নে হলে ব্যাপক শস্যহানি, সূর্যাস্তে ফসলের অর্ধেক উৎপাদন এবং মধ্যরাত্রিতে হলে বসুন্ধরা সম্পদশালী হয়।

(৫৪) উত্তর হইতে দক্ষিণে তিনটি রেখা টানিতে হইবে এবং ইহাকে তিন দিয়া গুণ করিতে হইবে যাহাতে আড়াআড়ি নটি রেখা টানা যায়। প্রতিটি কোণে একটি করিয়া পাহাড় আকৃতির ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

(৫৫) তৎপর উত্তরপূর্বে ৩ সংখ্যা বসাইয়া দক্ষিণে পরবর্তী সব সংখ্যা বসাইতে বসাইতে অগ্রসর হও। ৩ সংখ্যাটি হইল কৃত্তিকা নক্ষত্র। শুরু অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে। বৈশাখ মাসে অজ সংক্রান্তি সংঘটনের সময় নক্ষত্রের স্থিতির সহিত বৃষ্টিপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশাখ মাসের বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত জ্ঞান হইবে।

(৫৬) রোহিনী থেকে উত্তরফাল্গুনী এবং জ্যেষ্ঠ থেকে পূর্বভাদ্রপদ অত্যধিক বৃষ্টিপাত; কৃত্তিকা, হস্তা, অনুরাধা বা উত্তরভাদ্রপদে খরা, অশ্বিনী বা স্বাতীতে সাধারণ বৃষ্টিপাত এবং ভরণী, চিত্রা, বিশাখা বা রেবতী নক্ষত্রে উত্তম বৃষ্টিপাত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাতের নির্দেশিকা

(৫৭-৫৮) যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে মেঘহীন আকাশ দৃশ্যমান হয় ও শ্রাবণ মাসে যদি ওই নক্ষত্রে বারিধারা বর্ষিত হয়, তবে সেই বৎসরের আশীর্বাদের ন্যায় বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে শুক্লপক্ষে, আর্দ্রা থেকে আরম্ভ করে দশটি নক্ষত্রে যদি বৃষ্টিপাত হয় তবে জলভূমি শুষ্ক ও শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়।

আষাঢ় মাসে বৃষ্টিপাতের নির্দেশিকা

(৫৯) আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় যদি বাতাস পূর্ব, দক্ষিণপূর্ব, দক্ষিণপশ্চিম, পশ্চিম, উত্তরপশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় তবে যথাক্রমে উত্তম, শস্য উৎপাদনে বিপর্যয়, অপ্রতুল বৃষ্টিপাত, শস্যহানি, বৃষ্টিপাত, প্রবল বায়ুপ্রবাহ এবং প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়।

(৬০) আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবম দিনে বৃষ্টিপাত হলে সংবৎসর বৃষ্টিপাত হবে, তা না হলে আর কবে বৃষ্টিপাত হবে?

(৬১) আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে যদি পর্বতের পূর্ব ঢাল স্বচ্ছ থাকে, বৃত্তাকার সূর্য প্রখর কিরণ বিকিরণ করে ও সূর্যাস্তের সময় মেঘে পরিব্যাপ্ত থাকে তবে সূর্য যতক্ষণ তুলারাশি থেকে নিষ্ক্রমণ না করে ততক্ষণ প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিপাতের নির্দেশিকা

(৬২) শ্রাবণ মাসে চন্দ্রের রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান কালে যদি বৃষ্টিপাত হয় তবে অবিরাম বৃষ্টিপাত ঘটিবে যতক্ষণ

না “হরি” জাগ্রত হন। (হরি বা বিষ্ণু, মধ্য আষাঢ়ে নিদ্রায় যান এবং জাগ্রত হন মধ্য কার্তিকে। শয়ন এবং উথ্থান) ।

(৬৩) রোহিণী নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থান কর্কট রাশিতে থাকাকালীন যদি বৃষ্টিপাত না হয় তবে ঋষি পরাশর মানুষের দুঃখে কেবলই অনুশোচনা করেন।

(৬৪) শ্রাবণ মাসে চন্দ্রের রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান কালে বৃষ্টিপাত

না হলে কৃষিজীবীদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় ও দুর্দশা পরিলক্ষিত হয়। আসন্ন বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত ধারণা

(৬৫) জলের ভেতরে বা কাছাকাছি জলস্তম্ভ সৃষ্টি হলে সৃষ্টিকর্তা বলেন সৃষ্টি রক্ষার্থে শীঘ্র বৃষ্টিপাত হইবে।

(৬৬) পিপীলিকা নিজের ডিম মুখে নিয়ে গর্ত থেকে নির্গত হলে বা হঠাৎ ব্যাঙ ডাকলে নিশ্চিত বৃষ্টিপাত ঘটিবে।

(৬৭) যদি বিড়াল, নকুল, সাপ প্রভৃতি প্রাণী গর্ত থেকে নির্গত হয় কিংবা মথেরা উত্তেজক অবস্থায় উড়ে বেড়ায় তবে বৃষ্টিপাত আসন্ন

(৬৮) যদি বালকেরা রাস্তার উপর ধুলো দিয়ে সেতু তৈরি করে বা ময়ূর নৃত্যরত হয় তবে নিশ্চিতভাবে বৃষ্টিপাত আসন্ন।

(৬৯) মানুষেরা যদি ক্ষত বা বাতের যন্ত্রণায় কষ্ট পায় এবং সাপ গাছের উপর অবস্থান করে তবে তাৎক্ষণিক বৃষ্টিপাতের সমূহ সম্ভাবনা।

(৭০) যদি জলচর পক্ষীকুল রৌদ্রে তাদের ডানা শুকোতে শুরু করে এবং আকাশে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকতে থাকে তবে তা আসন্ন বৃষ্টিপাতের সূচনা করে।

নক্ষত্রের গতিপথের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক

(এক ক্রান্তিরেখা থেকে অপর ক্রান্তিরেখা পর্যন্ত)

(৭১) মঙ্গল এবং শনি এক ক্রান্তিরেখা থেকে অপর ক্রান্তিরেখায় গমন করলে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী এবং বৃহস্পতি যদি পরে পরিভ্রমণ করে তবে পৃথিবী জলপূর্ণ হয়।

(৭২) গ্রহের উদয়, অস্ত, পরিবর্তিত গতিপথ, গতিবেগ বৃদ্ধি এবং রাজার উদ্যোগের উপর বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল

(৭৩) চিত্রা নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিরাজমান হইলে ভাঙাবৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা যখন স্বাতী নক্ষত্রে মিলিত হয় গভীর মেঘ সঞ্চারের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়।

(৭৪) পৃষ্যা নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত মেঘকে স্বাতী নক্ষত্রই মেঘমুক্ত করে ও শ্রাবণ মাসে সৃষ্ট মেঘপুঞ্জ রেবতী নক্ষত্রের দ্বারাই মেঘমুক্ত হয়।

খরার পূর্ব পরিস্থিতি

(৭৫) মঙ্গল গ্রহ উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাসাধ্যা, উত্তরভাদ্রপাদ, শ্রবণা, হস্তা, মূলা, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা এবং মঘা নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিলে খরা নিশ্চিত।

(৭৬) সূর্য মঙ্গলের অপর পার্শ্বে থাকিলে সমুদ্রও শুষ্ক হয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের স্থান পরিবর্তন হইলে পর্বতও নিমজ্জিত হয়।

(৭৭-৭৮) শুক্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকিলে বৃষ্টিপাত আসন্ন। সিংহ রাশিতে মঙ্গল অবস্থান করিলে পৃথিবী অঙ্গারপিণ্ডের ন্যায় অনুভূত হয় এবং সূর্যের সংস্পর্শে থাকিলে সমুদ্রও শুষ্ক হয়ে যায়।

কৃষি পরিচালনায় মনোনিবেশ

(৭৯) পরাশরের উক্তিতে, কৃষি পরিচালনায় মনোনিবেশ করলে সোনা ফলে এবং অমনোযোগী হলে দারিদ্র্য ডেকে আনে।

অন্যান্য ঋষিগণের উক্তি

(৮০) প্রত্যেকেরই তার পিতাকে অন্তঃপুরের এবং মাতাকে রন্ধনশালার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। আর গোপালন ও কৃষিকাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখা উচিত।

(৮১) কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যিক জ্ঞানের প্রয়োগ, স্ত্রীজাতি, রাজকীয় গৃহস্থালি প্রভৃতি পরিচালনার মুহূর্তের অমনোযোগিতা তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ডেকে আনে।

(৮২) জনগণের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী একজন সুদক্ষ ব্যক্তিরই কৃষিকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত কারণ অদক্ষ কৃষিজীবী দুর্দশা ডেকে আনে।

(৮৩) যে কৃষক গবাদির যত্ন করে, দৈনন্দিন চাষের কাজে যায়, সঠিক ঋতু চেনে, বীজের বিষয়ে যত্নশীল ও অনলস পরিশ্রমী তিনি ধনাঢ্য হন এবং দুঃখ ভোগ করেন না।

ভারবাহী পশু সম্পর্কিত নিয়মকানুন

(৮৪) কৃষিকাজে ভারবাহী পশুদের কষ্টের কোন কারণ যেন না ঘটে কারণ তাদের কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত ফসল ভোগ করা সকল রীতিতেই নিন্দনীয়।

(৮৫) ভারবাহী পশুদের নিপীড়নের মাধ্যমে চতুর্গুণ ফসল উৎপাদিত হয় কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণে তা অচিরেই বিনষ্ট হয়।

(৮৬) গুড়, পশুখাদ্য, ধোঁয়া, অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য এবং সকাল

বিকাল গোচারণের ফলে ভারবাহী পশুদের কষ্টের লাঘব হয়।

(৮৭) গোশালা যদি সুনির্মিত পরিচ্ছন্ন গোময় মুক্ত হয় তবে স্বল্প পুষ্টির সাহায্যেই গবাদি পশুদের পালন সম্ভব।

(৮৮) পরিচর্যার কি প্রয়োজন আছে যদি আশ্রয়স্থল থেকে গবাদি পশুরা সর্বাঙ্গে গোময় ও গোমুত্র মাখা অবস্থায় নির্গত হয়?

(৮৯) গোশালা যদি পাঁচ পদ পরিমাণ দৈর্ঘ্যের হয় তবে তা গবাদি পশুর পক্ষে অনুকূল হয়। সিংহ রাশিতে সূর্যের উপস্থিতি কালে গোশালা নির্মাণ করলে গোকুলের ধ্বংসের কারণ ঘটে।

(৯০) গোশালায় কাঁসার পাত্রে গাঁজলা ওঠা গরম জল বা মাছ ধোয়া জল রাখা ও পশম আঁচড়ানোর কাজ করা গবাদি পশুর পক্ষে ক্ষতিকর।

(৯১) গোশালায় ঝাঁটা, নোড়া, পরিত্যক্ত গৃহস্থালি প্রভৃতি পরিচালনায় মুহূর্তের বাসি খাবার রাখা ও ছাগল বেঁধে রাখা অমনোযোগিতা তাৎক্ষণিক বিপর্যয় গবাদি পশুর পক্ষে ক্ষতিকর।

(৯২) যদি গৃহস্বামী গোমুত্রের সাহায্যে নিকট কি প্রত্যাশা করা যায়?

(৯৩) গবাদি পশুর হিতার্থে ভুলবশতও রবিবার, মঙ্গলবার ও শনিবারে গোময় স্পর্শ করা উচিত নয়।

(৯৪) উক্ত তিন দিন বাদ দিয়ে ঘুঁটে দেওয়া উচিত; নচেৎ তা পরিজনের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৯৫) গোশালায় সন্ধ্যাপ্রদীপ না দিলে গোকুল অশ্রুবর্ষণ করে ফলে ধনলক্ষ্মী বিরূপ হন।

(৯৬) আটটি ষণ্ড দিয়ে লাঙল টানা উচিত, সাধারণ কৃষকেরা ছয়টি

ব্যবহার করে, নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা চারটি ব্যবহার করে, দুটির ব্যবহার গোহত্যার সামিল।

(৯৭) দশটি লাঙল ব্যবহার করলে ধনলক্ষ্মী অটুট থাকেন, পাঁচটির ব্যবহারে ধনলাভ হয়, তিনটির দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন হয় এবং একটিতে ঋণের বোঝা বাড়ে।

(৯৮) দুটি লাঙলের ব্যবহারে কোনক্রমে একজনের দিন গুজরান হয়, তিনি পূর্বপুরুষ, দেবতা ও অতিথি সৎকারে অপারগ হন।

গোপূজা সম্বন্ধীয় বর্ণনা

(৯৯) কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষে (লগুড় প্রতিপদ) গরুর শিংয়ে একটি শ্যামা গুল্ম বেঁধে ও গায়ে তেলহলুদ মাখিয়ে গোপূজা করণীয়।

(১০০-১০১) অশুভ শক্তির বিনাশের নিমিত্ত জাফরান ও চন্দনে চর্চিত গবাদি পশুপালকে সালংকারে সুসজ্জিত করে এবং হাতে দণ্ড নিয়ে মৌখিক ও যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে প্রধান ষণ্ডটিকে গ্রামের চারপাশে ঘোরানো হয়।

(১০২) কার্তিকের প্রথম দিনে এক ব্যক্তি কৃষকগণের সঙ্গে গবাদি পশুর অঙ্গে তেল ও হলুদ মিশিয়ে লেপন করবে।

(১০৩) ঐ দিন লৌহ উত্তপ্ত করে গরুর দেহে স্পর্শ করাইয়া উহার লেজের অগ্রভাগ, কেশাগ্র ও কর্ণকেশের অগ্রভাগ কর্তন করিতে হইবে।

(১০৪) যে ব্যক্তি এইরূপ উপাচার পালন করিবে তাহার সমস্ত গোপাল সংবৎসর নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত থাকিবে।

গবাদি পশুর যাত্রা ও প্রবেশ

(১০৫) পূর্বফাল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া ও পূর্বভাদ্রপদ এই ত্রয়ীর ত্র্যহস্পর্শে এবং ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা ও শতভিষা নক্ষত্রের অন্তর্গত অবস্থায় গোশালায় প্রথম বারের গোযাত্রা ও প্রবেশ খুবই মঙ্গলদায়ক হয়।

(১০৬-১০৭) উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, শুক্লপক্ষের প্রথম, অষ্টম ও চতুর্দশ দিনে এবং পুষ্যা, শ্রবণা, হস্তা, চিত্রা নক্ষত্রের অবস্থান কালে গবাদি পশুগণের যাত্রা অনুচিত এবং কৃষি বা অন্যকাজে নিযুক্ত করলে গবাদি ও অন্যান্য ছোলাভোজী পশুর ধ্বংস অনিবার্য।

(১০৮) গবাদি পশুগণের যাত্রা বা প্রবেশ যদি রবিবার, শনিবার ও মঙ্গলবারে হয় তবে যাত্রাকালে গবাদি পশুর বিনাশ ও প্রবেশকালে গৃহস্থের মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে।

গোময় স্তূপ উত্তোলন

(১০৯) মাঘ মাসে শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনা করে কোন এক শুভ দিন এবং শুভ নক্ষত্রে গোময় উত্তোলন করতে হয়।

(১১০) গোময় রোদে শুকিয়ে চূর্ণ করার পর সেই সার ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক ক্ষেতে নির্দিষ্ট গর্তে জমিয়ে রাখতে হয়।

(১১১) বীজ বপনের সময় সেই সার বাহির করতে হয় কারণ সার ছাড়া ধানগাছে ফলন হয় না।

লাঙলের যন্ত্রাংশের বিবরণ

(১১২) ঈষা, যুগ, হলস্থাণু, নির্জোল, পাশিকা, আদ্যকলা, শৌল ও পচ্চনি এই আটটি লাঙলের যন্ত্রাংশ।

(১১৩) ঈষা আট হাত, স্থাণু পাঁচ বিঘৎ, নির্জোল দেড় হাত পরিমাণ এবং যুগের পরিমাপ গবাদি পশুর কান অবধি বিস্তৃত।

(১১৪) নির্জোলের পাশিকা ও আদ্যকলা উভয়ের দৈর্ঘ্য ১২ আঙুল পরিমাণ এবং শৌলার পরিমাপ এক হাত।

(১১৫) অগ্রভাগে লৌহ বেষ্টনী সহ বাঁশের তৈরি অতি শক্ত পানিকা ১২১/২ মুষ্ঠি বা ৯ মুষ্ঠি লম্বা।

(১১৬) গোলাকার আবাদ্ধা ৫৪ আঙুল পরিমাণ, জোত্রা ও দড়ি যথাক্রমে চার হাত ও পাঁচ হাত পরিমাণ লম্বা।

(১১৭) অর্কপত্র সদৃশ ফলাকার দৈর্ঘ্য ৯ আঙুল অথবা এক হাত কিংবা এক হাত পাঁচ আঙুল পরিমাণ।

(১১৮) বিদ্ধকার ২১টি শলাকা থাকে। নয় হস্ত পরিমিত মাধিকা সকল কার্যক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট।

(১১৯) ঋষি পরাশরের মতানুযায়ী লাঙলের এই উপাদানসমূহ সব ধরনের কৃষিকাজের পক্ষে উপযোগী যা কৃষকদের খুব সুদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা উচিত।

(১২০) যদি লাঙলের এই উপাদানসমূহ সুদৃঢ় ও সঠিক মানের না হয় তবে কৃষিকাজের সময় প্রতি পদক্ষেপে নিঃসন্দেহে তা ভারবাহী পশুদের অসুবিধার কারণ ঘটায়।

হল প্রসারণ উৎসব

(১২১) স্বাতী, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা ও হস্তা নক্ষত্রে হল প্রসারণ উৎসব (প্রদীপ জ্বালিয়ে লাঙল চালনা) পালন করা বিধেয়।

(১২২) কৃষির ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষকগণের শুক্রবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার ও বিশেষত বুধবারে হল প্রসারণ উৎসব পালন করা বিধেয়।

(১২৩) মঙ্গলবার, রবিবার ও শনিবারে কোনরূপ কৃষিকাজ করা অনুচিত কারণ তা রাজত্বের অশুভের পূর্বলক্ষণ সূচিত করে।

(১২৪) শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন শুভ হিসাবে পরিগণিত হয়।

(১২৫) শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে শস্যহানি, দ্বাদশ দিনে মৃত্যু অথবা কারাবাস; ষষ্ঠ দিনে নানা বাধা এবং প্রতিপদে চন্দ্র অদৃশ্য হইলে কৃষকের বিনাশ হয়।

(১২৬) শুক্লপক্ষের অষ্টম দিনে ষণ্ডের মৃত্যু, নবম দিনে শস্যহানি, চতুর্থ দিনে কীটের প্রাবল্য এবং চতুর্দশ দিনে গৃহস্বামীর মৃত্যু সম্ভাবনা।

(১২৭) বৃষ, মীন, কন্যা, মিথুন, ধনু ও বৃশ্চিক রাশিতে সূর্যের প্রবেশকালে হল প্রসারণ উৎসব পালন করা কল্যাণকর।

(১২৮) সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশকালে হল প্রসারণ উৎসব অনুষ্ঠান করলে গো নিধন; কর্কটরাশিতে প্রবেশকালে জলজ প্রাণীর ভয়, সিংহরাশিতে প্রবেশকালে সিংহরাশিতে প্রবেশকালে সর্পভয় এবং কুম্ভরাশিতে প্রবেশকালে চোরের ভয় হয়।

(১২৯) বৃশ্চিকরাশিতে শস্যহানি এবং তুলারাশিতে জীবনহানির আশঙ্কা। সুতরাং কৃষিকাজের সূচনায় সূর্যের রাশি প্রবেশকালের ফলাফল সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করা উচিত।

(১৩০-১৩২) সূর্য ও চন্দ্রের শুভস্থানে অবস্থানকালে স্নান করে এক জোড়া সাদা কাপড় পরিহিত হয়ে চন্দন ও ফুল সহ দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, পৃথু এবং প্রজাপতির পূজা করে ও ব্রাহ্মণগণকে অর্ঘ্য নিবেদন করার পর লাঙলের ফলায় মধু মাখিয়ে ও স্বর্ণ স্পর্শ করে বামদিকে সর্পকুণ্ডলী স্থানে হল প্রসারণ উৎসব পালন করা হয়।

(১৩৩) বাসব (ইন্দ্র), শুক্র, পৃথু এবং ঋষি পরাশরকে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা আবাহন করতে হবে। অগ্নি, দ্বিজ এবং ঈশ্বরের আরাধনা করে হল প্রসারণ উৎসব পালন করতে হবে।

(১৩৪) এক জোড়া কালো বা লাল বা লাল-কালো ষাঁড় লাঙল কর্ষণের পক্ষে উপযোগী। উহাদের মুখের দুই পাশে মাখন বা ঘি লেপন করতে হবে।

(১৩৫-১৩৬) উত্তরমুখে উপবিষ্ট হয়ে দুধ, ময়দা ও ক্ষীর সহযোগে প্রস্তুত নৈবেদ্য প্রদান করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে 'প্রভু নৈবেদ্য গ্রহণ করুন, উত্তম বৃষ্টিপাত দান করুন।'

(১৩৭-১৩৮) ধর্মপ্রাণ কৃষক একাগ্রচিত্তে হাঁটুদ্বয় মাটিতে রেখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে ইন্দ্রের আরাধনা করে মন্ত্রোচ্চারণ করবেন 'প্রভু আপনার কাছে বিনত হই, বাধামুক্ত করে ধনধান্যে সম্পদশালী করুন।'

(১৩৯) শস্যের পর্যাপ্ত ফলনের জন্য মেঘ সহ বাতাসের দেবতাকে অবশ্যই ঘিয়ের প্রদীপ সহ নৈবেদ্য নিবেদন করতে হবে।

(১৪০) তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে 'অভ্যন্তরে স্বর্ণভাণ্ডার

সমৃদ্ধ, শেষনাগের সমৃদ্ধ, শেষনাগের উপর শায়িত এবং প্রাণী ও জড়বস্তু উপর শায়িত এবং প্রাণী ও জড়বস্তু সমূহের ধাত্রী হে ধরিত্রীমাতা আমাকে সমূহের ধাত্রী হে ধরিত্রীমাতা আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন।'

(১৪১) নিতম্বভারে ক্লিষ্ট কিংবা লেজ বা কান কাটা অথবা সম্পূর্ণ সাদা কোন ষণ্ড কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযুক্ত।

(১৪২) ঋষি পরাশর বলিয়াছেন যে হলরেখা খণ্ডিত হইবে না। হলরেখা একটি, তিনটি বা পাঁচটি হইবে।

(১৪৩) এক হলরেখা বিজয় লাভের পক্ষে অনুকূল, তিনটি হলরেখা সাফল্যের সহায়ক এবং পাঁচটি হলরেখা ধনধান্য প্রদায়িনী।

(১৪৪) লাঙল চালনার সময়ে কচ্ছপ উত্থিত হলে কৃষকের স্ত্রী বিয়োগ এবং অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে।

(১৪৫) লাঙলের ফাটলের জন্য বলপূর্বক কর্ষণের ফলে স্বীয় ভূমি পরিত্যক্ত হয় এবং লাঙল খণ্ডিত হলে ভূস্বামী ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

(১৪৬) ইশায় ফাটল হলে কৃষকের প্রাণহানির আশঙ্কা এবং যুগা ভেঙে প্রাণহানির আশঙ্কা এবং যুগা ভেঙে গেলে ভ্রাতৃবিয়োগ ও শৌলা ভেঙে গেলে পুত্র বিয়োগের আশঙ্কা থাকে।

(১৪৭) যোত্র নষ্ট হয়ে গেলে শস্যের রোগ ও শস্যহানির আশঙ্কা থাকে। কৃষকের ক্ষতির কারণে রাজ্যপাটের সংকট হতে পারে।

(১৪৮) হলকর্ষণকালে বৃষ পতিত হলে লোকেরা জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হতে পারে।

(১৪৯) হলকর্ষণকালে বৃষ পলায়ন করলে কৃষকের কৃষিকাজে ক্ষতি হয় এবং শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

(১৫০) শস্য উৎপাদন চতুর্গুণ হয় যদি হলকর্ষণকালে বৃষ ন্যাসাত্যাগ করে লেহন করে।

(১৫১) যদি হলকর্ষণকালে বৃষ গোময় ও গোমুত্র ত্যাগ করে তবে উক্ত কারণে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(১৫২) কর্কট ও মকর রাশিস্থিত 'বালপ্রসন্ন' অনুষ্ঠান না করলে কৃষক সুফলের আশা করতে পারে কি?

(১৫৩) যদি কৃষক 'বালপ্রসন্ন' অনুষ্ঠান না করে কেবল আত্মগর্বী শক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ করে তবে তা বিফল হয়।

(১৫৪) মৃত্তিকা মাঘে স্বর্ণ, ফাল্গুনে রৌপ্য, চৈত্রে তাম্র ও বৈশাখে ধান্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

(১৫৫) মৃত্তিকা জ্যৈষ্ঠে মাটির ন্যায়, আষাঢ়ে কর্দমাক্ত ও শ্রাবণে কর্ষিত মৃত্তিকা বন্ধ্যা হয়।

পরাশর আরও বলেন

(১৫৬) হেমন্তের কর্ষিত মাটি সোনা ফলায়, বসন্তে কর্ষিত মাটি তামা বা রুপো ফলায়, বর্ষার প্রারম্ভে কর্ষিত জমি দারিদ্র্য আনে।

শস্যবীজ সংরক্ষণ বিধি

(১৫৭) মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সব বীজ সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুষ্ক করুন; ওগুলোকে নিচে রাখবেন না।

(১৫৮) তুষ ঝেড়ে ফেলে শস্যবীজকে ক্ষুদ্র থলিতে ভরে রাখুন, তুষমিশ্রিত বীজ শস্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর।

(১৫৯) সমাকৃতি বীজ রোপণ করলে শস্যের প্রাচুর্য হয়, সমাকৃতি বীজ তৈরি করতে যত্নবান হোন।

(১৬০) বাড়তি অংশ কেটে বাদ দিয়ে বীজ শক্ত করে পুঁটুলি বেঁধে রাখতে হবে, নচেৎ তা থেকে গাছ বেড়ে যাবে।

(১৬১) বল্মীকস্তূপ অর্থাৎ উইঢিপির উপর বীজ রাখা সম্পূর্ণ অবিধেয়, অথবা গোস্থানে (গোয়লঘরে আঁতুড়ঘরে অথবা বন্ধ্যা নারীর গৃহে।

(১৬২) বীজকে রক্ষা করতে হবে উচ্ছিষ্ট/অবশিষ্ট খাদ্য, ঋতুমতী স্ত্রীলোক, বন্ধ্যা, সদ্যপ্রসূতি এবং গর্ভিনীর সংস্পর্শ থেকে।

(১৬৩) কৃষক কখনও, ভ্রম বশতও, ঘি তেল মাখন বর্তিকা ও লবণের সংস্পর্শে বীজ রাখিবেন না।

গার্গ্য আরও বলেন

(১৬৪) যে বীজ বর্তিকা অগ্নি ধূম স্পর্শে এসেছে, বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা আবৃত অবস্থায় রক্ষিত হয়েছে কোন গর্তে – তা পরিত্যাগ করতে হবে।

(১৬৫) কখনও, ভ্রমক্রমেও সেই বীজধান বপন করবে না যা মাটিচাপা দেওয়া ছিল কিংবা মিশ্রিত ছিল। ধান ব্যতীত অন্যান্য (বিধান্য) তুষ অথবা খুদ মিশ্রিত থাকলে সে বীজ বন্ধ্যা হয়।

(১৬৬) কৃষক, সার, ঊর্বরাভূমি (কেদার), ষাঁড়, বর্ষণশীল মেঘপুঞ্জ – সকলই বিফল হবে যদি বীজ ফলবতী না হয়।

(১৬৭) তিল ধান্য ও যব – এই তিন শস্যের বিষয়ে এই

নিয়মগুলি কথিত হল। সুতরাং মনে রাখবে বীজের যত্নের কথা। সুফসলের মূল হল উত্তম বীজ।

অথ বীজবপন বিধি

(১৬৮) বপনের শ্রেষ্ঠ কাল হল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মধ্যম, আষাঢ় মন্দ আর শ্রাবণে বীজ বপন অধমেরও অধম।

(১৬৯) রোপনের নিমিত্ত বীজ বপনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল আষাঢ়, শ্রাবণ মধ্যম এবং ভাদ্রে (রোপনের জন্য) বপন অধমাদপি অধম।

(১৭০) ত্রি উত্তরনক্ষত্রে (উত্তর ফাল্গুনী, উত্তর আষাঢ় ও উত্তর ভাদ্রপদ), মূলা জ্যৈষ্ঠা অনুরাধা মাঘ মৃগশীর্ষ রোহিনী হস্তা এবং রেবতীতেই বীজ বপনের কৃষ্ট সময় ।

(১৭১) শ্রাবণে, ত্রিপূর্বায় ((১৭১) শ্রাবণে, ত্রিপূর্বায় (পূর্বফল্গুনী পূর্বাষাঢ়া ও পূর্ব ভাদ্রপদ) বিশাখা ভরণী আর্দ্রা ও অশ্লেষায় বীজ বপনকারী বীজমাত্রই ফেরত পায়।

(১৭২) বপন ও রোপনের ক্ষেত্রে দুইটি দিন বাদ দেওয়া বিধেয়, মঙ্গলে ইঁদুরের ভয়, শনিবারে পঙ্গপাল ও অন্যান্য পতঙ্গের।

(১৭৩) চন্দ্রের ক্ষয়কালে (কৃষ্ণপক্ষে) রিক্তা তিথিতে (চতুর্থী নবমী এবং চতুর্দশতম দিন) বীজ বপন করা হবে না। এসকল বিধি মেনে যে গৃহস্থ শস্য রোপন করবে অবশ্যই তার কৃষিতে শস্যবৃদ্ধি হবে।

(১৭৪) উৎকৃষ্ট ফল লাভেচ্ছু ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ আষাঢ় মাসের আরম্ভকালে সাড়ে তিন দিন কোন ফসলের বীজ বপন থেকে বিরত থাকবেন।

(১৭৫) বৃষরাশির (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের) শেষ ও মিথুনরাশির (আষাঢ়)

আরম্ভের মধ্যবর্তী তিন দিন ধরণী ঋতুমতী হন। এই সময়ে বীজ বপন বিধেয় নয়। এই নিয়মের অন্যথা করলে (সেই ব্যক্তি) পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(১৭৬) মৃগশিরার অবমান এবং আর্দ্রার প্রথম এক চতুর্থাংশে অম্বুবাচীতে ভূমি ঋতুমতী হন। এ সময়ে তিন দিন কর্ম বর্জন করাই বিধেয়। কৃষক যদি এই সময়ে ক্ষেতে গিয়ে বীজ বপন করে, সে ফসল পাবে না। এই দিন (কৃষির জন্য) হানিকারক।

(১৭৭) হিমবারিতে নিষিক্ত বীজের তিনমুষ্টি শুদ্ধ ও একাগ্র চিত্তে ইন্দ্রকে স্মরণ করে স্বয়ং বপন করতে হবে।

(১৭৮-১৮০) ধানের পুণ্যাহ (শুভদিন) পালন করে কৃষক হৃষ্টচিত্তে একটি মাটির কলম হাতে পূর্বদিকে মুখ করে এই অতি উত্তম মন্ত্র পাঠ করবে — বহুশস্যদায়িনী দেবরাজ্ঞী হে সর্বসৌভাগ্যবতী বসুন্ধরা, তোমাকে প্রণাম করে উপ্ত এই সকল শস্যকে তুমি বর্ধিত ও অঙ্কুরিত কর। কৃষক সুস্থ থাকুক, সুবর্ষণ হোক ও শস্যের প্রাচুর্য হোক ।

(১৮১) বীজ বপন শেষে বপনক্ষেত্রে ঘি যুক্ত অন্ন ও পায়সান্ন ভক্ষণ দ্বারা প্রসন্নতা বর্ধন করলে কৃষিকাজের সর্ববাধা দূর হয়।

অতঃপর ময়িকা (মদিকা) প্রয়োগ

(১৮২) বীজ বপনের পর শস্যক্ষেত্রে ময়িকা প্রয়োগ করতে হবে। এটি না হলে ক্ষেতের সর্বত্র সমভাবে বীজ অঙ্কুরিত হবে না।

রোপণের নিয়মাবলী

(১৮৩) বীজ দুই প্রকার বপন ও রোপণ। বপনের নিমিত্ত বীজ রোগমুক্ত কিন্তু রোপণের বীজ সর্বদা রোগাক্রান্ত হয়।

(১৮৪) পূর্ণবয়স্ক ধান্যচারা থেকে কখনও রোপণের জন্য চারা সংগ্রহ করবে না। যে চারা কেদারে (ক্ষেতের মাটিতে) দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে তাকে উৎপাটিত করে রোপণ করলে তা ফলদায়ী হয় না।

(১৮৫) কর্কটে (শ্রাবণে) এক হস্ত পরিমাণ দূরত্বে, সিংহে (ভাদ্র মাসে) অর্ধহস্ত এবং কন্যারাশিতে (আশ্বিনে চার অঙ্গুল পরিমাণ দূরত্বে রোপণ করতে হবে। এই বিধান সমস্ত শস্যের জন্যই বিধেয়।

(১৮৬) বুদ্ধিমান কৃষক আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধানক্ষেতে নিড়ানির জন্য উদ্যোগী হবে। যে ধানক্ষেতে নিড়ানি হয়নি, সেখানে বীজের সমপরিমাণ ফসলই হবে।

(১৮৭) কৃষির প্রতি মনোযোগী জন শ্রাবণ মাসে যখন বৃষ্টিপাত না হয়, তখন নিড়নির ব্যবস্থা করবেন। ভাদ্র মাসে নিড়ানির কাজ করলে ফসলের অর্ধেক মাত্র পাওয়া যাবে, আশ্বিনে করলে কিছুই পাওয়া যাবে না।

(১৮৮) যে জমি নিচু সেখানে ধানচারার রোপন বা নিড়ানি কিছু করার দরকার নেই, সেই ক্ষেতে সার দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। ঘাস ছিঁড়ে দেওয়া মাত্রই যথেষ্ট।

ধান্যক্ষেত্রে ঘাস নিড়ানো

(১৮৯) প্রচুর চারা হলেও ধান্যক্ষেত্র যদি ঘাস থেকে মুক্ত করা না হয়, তবে শস্যের যথেষ্ট পরিমাণ ফলন হবে না। আগাছার দরুণ কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১৯০) কর্কটরাশিতে (শ্রাবণ) ও ভাদ্র মাসে যদি জমির আগাছা মোচন করা যায়, তবে পরে ঘাস জন্মালেও ধানের শস্য দ্বিগুণ

ফলন হবে।

(১৯১) আশ্বিন মাসে দুই বার ধানক্ষেতে ঘাস ছিঁড়ে দিলে মাসকলাইয়ের মত অজস্র ফলন হয়।

(১৯২) অতএব কৃষিক্ষেত্রকে সযত্নে ও যথাসময়ে, আগাছা ও তৃণমুক্ত করতে হবে। তবে কৃষক মনোমত ফসল লাভ করবে।

ভাদ্র মাসে জমির জল ছেড়ে দেওয়া

(১৯৩) ধানকে রোগমুক্ত রাখবার জন্য ভাদ্র মাসে ক্ষেতের জলের নিকাশি করতে হবে। এখন কেবল শিকড় পর্যন্ত জলই রক্ষা করা বিধেয়।

(১৯৪) কৃষিক্ষত্রে ভাদ্র মাসে জল জমা থাকলে ধানগাছে নানাবিধ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এবং কৃষক তার আশানুরূপ শ্রেষ্ঠ ফসল পায় না।

অতঃপর ধানকে রোগমুক্ত করার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ

ওঁ সিদ্ধি গুরুপদে প্রণাম। মঙ্গল হোক। হিমগিরির শিখরে শঙ্খ ও কুন্দফুলের ন্যায় শুভ্র শিলাতট থেকে সুমঙ্গল নন্দনকানন থেকে পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ সমুদ্রতটে বিজয়ী শ্রীরাম বহু শত সহস্র বানরগণ মধ্যে তীক্ষ্ন আথ ও উর্দ্ধলাঙ্গুলশালী পনবসূত বায়ুবেগ শুভশাসন প্রবর্তক শ্রীহনুমানকে অন্যান্যের কুশল জ্ঞাপন করতে বললেন অমুকগোত্রের অমুকজনের ক্ষেত্রখণ্ডে বর্তমান শস্যনাশক কীট পতঙ্গ বন্য বা গৃহপালিত ছাগ

শূকর হরিণ মহিষ চড়াই শুকপক্ষী (টিয়া) যদি তোমার বচনে দ্রুত শস্যক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে তবে তোমার বজ্রলাঙ্গুলের প্রহারে তাদের তাড়না করবে ইতি ওঁ...

(১৯৫) এই মন্ত্র অলক্তক দ্বারা লিপিবদ্ধ করে ক্ষেত্রমধ্যে রক্ষিত হলে, সেই ক্ষেত্র (ধানের) রোগ, কীট অথবা পশুভয় থেকে মুক্ত থাকে।

অতঃপর জল রক্ষণ বিধি (১৯৬) আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ধানের জন্য জল রক্ষণ বিধি যে পালন করে না সেই মূর্খ কীই বা ফসলের করতে পারে?

(১৯৭) বংশের সুনাম আকাঙ্ক্ষাকারী যেমনভাবে কুলস্ত্রীদের রক্ষার প্রতি যত্নবান হয় সেই রকম (যত্নে) শরৎকালে ক্ষেত্রে জলসংরক্ষণ করবে।

(১৯৮) অতঃপর কার্তিক সংক্রান্তিতে ভাদ্র মাসে জমির জল ছেড়ে দেওয়া কৃষক শুদ্ধ শরীরে ঈশানকোণের শুদ্ধ শরীরে ঈশানকোণের বিষয়ে কেদারে সপত্র নল রোপণ করবে।

(১৯৯) তৎপরে সুমনোহর গন্ধমাল্য ধূপ সহযোগে সেই নল ও অন্য বৃক্ষাদির পূজা করবে।

(১৯৩) ধানকে রোগমুক্ত রাখবার জন্য ভাদ্র মাসে ক্ষেতের জমা জলের নিকাশি করতে হবে। এখন কেবল শিকড় পর্যন্ত জলই রক্ষা করা বিধেয়।

(১৯৪) কৃষিক্ষেত্রে ভাদ্র মাসে জল জমা থাকলে ধানগাছে নানাবিধ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এবং কৃষক তার আশানুরূপ শ্রেষ্ঠ ফসল পায় না।

(২০০) এবারে দধি নৈবেদ্য বিশেষত পায়স, যত্ন সহকারে সহকারে

সংগৃহীত তালঅস্থি১ দিয়ে ভক্তদের প্রসন্ন করবে।

সেই নিমিত্ত মন্ত্র এইরূপ

(২০১–২০৩) শিশু তরুণ বৃদ্ধ অথবা অতঃপর ধানকে রোগমুক্ত করার জন্য অন্যরূপ, সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অন্যরূপ, সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, মন্ত্রোচ্চারণ রোগাক্রান্ত অথবা স্বাস্থ্যবান, সমস্ত ধান্যচারা এই নলের স্পর্শে সুষেণ রাম ও পৃথুর আদেশে সমান হোক, প্রচুর ফলদায়ী হোক। কৃষক সর্বরোগমুক্ত হয়ে প্রচুর ধান্য এবং সম্পদলাভ করুক।

(২০৪) এই মন্ত্রোচ্চারণ সহ ঠিকমত ভাবে নলকে ক্ষেত্রে রোপণ করা হলে কৃষক দ্রুত প্রভূত ধান্যলাভের আশায় হৃষ্টমনে থাকে।

ওঁ সিদ্ধি গুরুপদে প্রণাম। মঙ্গল হোক। হিমগিরির শিখরে শঙ্খ ও কুন্দফুলের ন্যায় শুভ্র শিলাতট থেকে সুমঙ্গল নন্দ- নকানন থেকে পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ সমুদ্রতটে বিজয়ী শ্রীরাম বহু শত সহস্র বানরগণ মধ্যে তীক্ষ্ণনখ ও ঊর্দ্ধলাঙ্গুলশালী পবনসুত বায়ুবেগ শুভশাসন প্রবর্তক শ্রীহনুমানকে অন্যান্যের কুশল জ্ঞাপন করতে বললেন

(২০৫) ধট সংক্রান্তিতে (সূর্যের তুলারাশিতে অবস্থানকাল, আশ্বিন সংক্রান্তি) যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে নল রোপণ না করে তার সমস্ত প্রকারের ধান নষ্ট হয়ে যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে এক অঞ্জলি ধান হাতে নিয়ে

(২০৬) অতঃপর অগ্রহায়ণের আরম্ভে শুভদিনে শুদ্ধভাবে আড়াই মুষ্টি ধান কেটে নিতে হবে।

(২০৭) গন্ধচন্দন ধূপ পুষ্পনৈবেদ্য সহ ধান্যগুচ্ছের অর্চনা করে ক্ষেত্রের ঈশান কোণ থেকে ধান(গাছ) মুষ্টি কেটে নিতে হবে।

(২০৮) কর্তিত গোছাটি, যার শিষগুলি সামনের দিকে ঝুলে থাকবে, মাথায় নিয়ে এবং অন্য কিছু স্পর্শ না করে, কারো সঙ্গে কথা না বলে, কৃষক গৃহের দিকে রওনা হবে।

(২০৯) মূল গৃহে প্রবেশ করে সপ্তপদ অগ্রসর হয়ে সুপূজিত ধান(গাছ) মুষ্টিকে পূর্ব দিকে স্থাপিত করবে।

(২১০) এই ধান্যমুষ্টি কখনই কার্তিক অথবা পৌষে গ্রহণীয় নয়। অগ্রহায়ণেই এ সংগ্রহ করা শ্রেষ্ঠ, তখনই এ সম্পদ আর প্রচুর ধান আনয়ন করে।

(২১১) ওই সার্ধ-দ্বিমুষ্টি ধান সংগ্রহ না করে যে ফসল কাটে সে প্রতি পদক্ষেপে বিফল হবে, তার গৃহে ধান পৌঁছবে না।

(২১২) জ্ঞানীদের মতানুযায়ী ধানকাটা শুরু করার প্রকৃষ্ট দিন (নক্ষত্র অনুযায়ী) আর্দ্রা মঘা কৃত্তিকা পুষ্যা হস্তা স্বাতী উত্তর-ফাল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তর- ভাদ্রপদ মূলা ও শ্রবণা।

(২১৩) ব্যতিপাতে ভাদ্রে রিক্তা অথবা বৈধৃতে, মঙ্গল বুধ ও শনিবারে ধানক্ষেত থেকে মুষ্টিগ্রহণ অবিধেয়।

অগ্রহায়ণে মেধি রোপণ বিধি

(২১৪) অগ্রহায়ণে একটি সমতল (গর্ত খনন করে, উত্তমরূপে গোময় লিপ্ত করে মেধি আরোপণ স্থল প্রস্তুত করতে হবে।

(২১৫)সূর্য বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান কালে স্ত্রীনামধারী বৃক্ষের কাঠ দিয়ে কৃষক মেধি তৈরি করবে। উত্তম মেধিতে মেধি উত্তম হয়।

(২১৭-২১৮) ন্যগ্রোধ আদির অপ্রাপ্তিতে অন্য যে কোন স্ত্রীনামধারী বৃক্ষ ব্যবহার করা যাবে। নিম ও সর্ষপ পাতায় সজ্জিত এবং ধান, তৃণ ও কর্কটক যুক্ত গন্ধচন্দন ও পুষ্পে পূজিত মেধি শস্যজনিত আনন্দ প্রদান করে।

(২১৯) পৌষ মাসে অথবা কোন অশুভ দিনে অথবা শ্রবণা নক্ষত্রে মেধি আরোপণ অবিধেয়। পৌষে আরোপিত মেধি শস্যহানি ঘটায়। অন্যপক্ষে অগ্রহায়ণে আরোপিত মেধি দ্বারা শস্য বৃদ্ধি ঘটে।

(২২০) যারা নিজের সুখসমৃদ্ধি চায় এরকম ব্যক্তি কখনই কপিত্থ (কয়েতবেল), বিল্ব, বাঁশ ও তৃণরাজ (নারকেল?) ব্যবহার করবে না।

(২২১) পৌষ মাসের শুভদিনে অকর্তিত ধান্যক্ষেত্রের কাছাকাছি লোকেরা কাছাকাছি লোকেরা একত্রিত হয়ে পুষ্যযাত্রা করবে।

(২২২) সেইখানে হিং মরিচ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত অতি উত্তম নিরামিষ ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস ও পরমান্ন সহযোগে

(২২৩) দধি দুধ তথা দুগ্ধজাত অন্যান্য সামগ্রী ও পায়স, নানান ফলমূল প্রচুর মিষ্টান্ন ও পিষ্টক সহযোগে

(২২৪) কলাপাতার উপর শ্রীপূর্ণভাবে এসকল ব্যঞ্জন ও অন্ন পরিবেশন করে প্রথমে বৃদ্ধদের ও পরে সর্বজনকে সযত্নে ভোজন করাবে।

(২২৫) অতঃপর সেই ক্ষেত্রেই হাত ও মুখ ধুয়ে পরস্পরকে চন্দন চতুঃসম

নববস্ত্র পরিধান করে

(২২৭) পুষ্প আভরণে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রদেবকে নমস্কার করে নৃত্যগীত বাদ্যাদি সহ মহা উৎসবে রত হবে।

(২২৮) এইভাবে অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে হাতজোড় করে পূর্বদিকে ফিরে এই চারটি শ্লোক উচ্চারণ করবে।

(২২৯) অখণ্ডিত ধান্যময় এই ক্ষেতে পুষ্যযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা সকলে, হে শুভপ্রদানকারী দেবী, আমরা সকলে তোমার প্রসাদ চাই।

(২৩০) চিন্তায় বাক্যে বা কর্মে যারা আমাদের বিরোধী, এই পুষ্যযাত্রার প্রসাদে তারা সকলেই হীনবল হোক।

(২৩১) আমাদের ধান বাড়ুক, যশ বৃদ্ধি পাক, দারাপুত্রের বিশেষ বৃদ্ধি হোক, রাজার কাছ থেকে পাওয়া সম্মান ও গাভী আদি পশু বেড়ে উঠুক।

(২৩২) এ সকল মন্ত্রের শাসনে দিবারাত্রি আমাদের ধন বৃদ্ধি পাক। এই সমৃদ্ধি আমাদের থাকুক সম্বৎসরের সমৃদ্ধি আমাদের থাকুক সম্বৎসরের জন্য।

(২৩৩) এই অর্চনার পর সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবে। সেই রাত্রে কেউ আর অন্য ভোজন করবে না ।

(২৩৪) পূর্বে পরাশর সমস্ত লোকের জন্য এই সুন্দর সর্বার্থসাধিনী পুষ্যযাত্রা করিয়েছিলেন।

(২৩৫) তাঁর (পরাশরের) দ্বারা কৃত এই পুষ্যযাত্রার ফলে সর্ব বিঘ্ন প্রশমিত হয়ে প্রভূত ধনবৃদ্ধি ঘটেছিল।

(২৩৬) ধনগর্বে যে জন পুষ্যযাত্রা করবে যথাযোগ্যভাবে ঝাড়াই (মর্দন) করে সঠিক আঢক দিয়ে মেপে তুলে নিতে হবে।

আঢক বর্ণন

(২৩৮) আঢক দ্বাদশ অঙ্গুলি মাপের হবে বলেই বলা হয়েছে। ফসল মাপবার সময়ে সর্বদাই বাঁদিক থেকে আরম্ভ করতে হবে, দক্ষিণ থেকে কখনই নয়।

(২৩৯) বাম ব্যতীত অন্যদিক থেকে শস্য মাপলে শস্যক্ষয় হয়, বামদিক থেকে মাপা পরম সুখ ধান্যবৃদ্ধিকারক।

(২৪০) শ্লেষ্মাতক আম ও পুন্নাগ কাষ্ঠের তৈরি আঢক উত্তম এবং সুখকারী, কম্পিলোকটী ও নিমকাষ্ঠের আঢক দারিদ্র্যবৃদ্ধি ঘটায়।

ধান্যস্থাপন বিধি

(২৪১) হস্তা শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পুষ্যা রেবতী আদি এবং প্রজাপতিসমূহ (উত্তর-ফাল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তর- ভাদ্রপদ) রোহিণী ভরণী মূলা সুন্দর মঘা নক্ষত্র বা পুনর্বসু নক্ষত্রে

(২৪২) শনিকে বাদ দিয়ে সোম বৃহস্পতি বা শুক্রবারে সূর্য মীনরাশিতে অবস্থানের পুণ্যসময়ে ধান্যস্থাপন (ভাণ্ডারে জমা) করাই উত্তম।

(২৪৩) এই মন্ত্র সহস্তে লিখে যিনি ধান্যাগারে নিক্ষেপ করবেন তার দ্বারা পূজিতা হয়ে লক্ষ্মী পরম সুখ ও সমৃদ্ধি দান করবেন।

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় ঔপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে

বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন চন্দন মুখার্জী আর অত্রি ভট্টাচার্য
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট সমীক্ষা করার পরিকল্পনা আছে।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা ছিল - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; চলতি পুথিতে বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। চলতি কৃষি পরাশর